তারবিয়াহ

ইস্যু-০৮ | ১৪৪২ হিজরি | ২০২২ ইংরেজি

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

সূচীপত্র

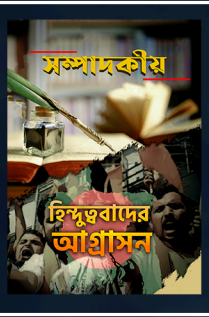

০৩

সম্পাদকীয়ঃ
হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন

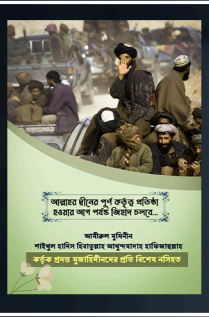

০৬

আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ চলবে...

০৮

স্বাধীনতার লড়াই.....
কী, কেন এবং কীভাবে?

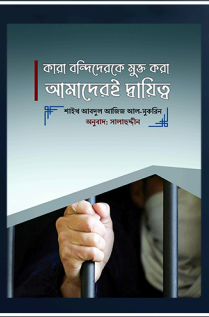

১৩

কারা বন্দিদেরকে মুক্ত করা আমাদেরই দায়িত্ব

১৬

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর সাথে কিছুক্ষণ (পর্ব – ৭)

২১

বড় জামাত কী?

২৭

সম্মান কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের জন্য

৩০

ইরান ও আমেরিকা বন্ধু না শত্রু?

৪৪

গাজওয়াতুল হিন্দ...
সময়ের আহবান

৪৭

একজন শহীদ 'মা' এবং তাঁর চার শহীদ ছেলের কাহিনী

৫৫

বদরের ময়দানে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার আমলী দৃষ্টান্ত

৫৮

গাজওয়াতুল হিন্দ...
আসুন, নবীজীর কথার বাস্তব নমুনা হই!
আসুন, নবীজীর সুসংবাদ গ্রহণ করি!

সম্পাদকীয়

হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে, যিনি আমাদেরকে এই ফেৎনার জমানায়ও হক্ক জা'মাআতের সাথে থেকে জিহাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ সমরবিদ নবীকুল শিরোমণি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, এবং তার পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত দ্বীন ও ইসলামের অনুসারি মুজাহিদিনের উপর।
মুহতারাম পাঠক !

'তারবিয়াহ' ম্যাগাজিনের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশের পথে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক ও প্রস্তুতকারী এবং শুভাকাঙ্খি সকল ভাইকে উত্তম বদলা দান করুন, আমীন। সাধারণত আমাদের এই ম্যাগাজিনে থাকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ কারি কিছু পাথেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন, আমীন।
মুহতারাম পাঠক !

আজ আমরা এমন এক কঠিন সময় পার করছি, যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে কটাক্ষ। তাগুতের প্রেতাত্ত্বারা ক্রমাগতভাবে আমাদের ধর্মের অবমাননা করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করলে শুরু হয় গড়িমসি। কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তা দমনে গড়িমসি করা আরো অপরাধ জন্ম দিতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে নানা জটিলতার। রংপুরের ঘটনাই ধরা যাক, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম অবমাননার অভিযোগ আসল। মানুষ প্রতিবাদ করল। পুলিশের কাছে মামলা নিয়ে গেল। মামলা নিতে পুলিশের যথারীতি গড়িমসি। মামলা নেয়ার পর শুরু হল তদন্তে ঢিলেমি, অপরাধী ধরতে গড়িমসি। বিক্ষুব্ধ জনতা দফায় দফায় আন্দোলন করল, আল্টিমেটাম দিল। সংশ্লিষ্ট কর্তাদের কোনো রা নেই। তাদের বোধোদয় হল তখন, যখন ঝরে গেছে তাজা ক'টি প্রাণ, আহতদের আর্তনাদে ভারি হয়েছে হাসপাতাল, আগুনে পুড়েছে কত অভাগার ঘর। এখন ব্যস্ততার শেষ নেই আইনশৃঙ্খলার কর্তাদের। পুরো দেশের মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হওয়ার পর টনক নড়েছে তাদের।

দায়ের হয়েছে বহু মামলা। গ্রেফতারের ভয়ে শত-সহস্র পুরুষ হয়েছে ঘরছাড়া। এখানেও উপরি কামাই-গ্রেফতারবাণিজ্য। মামলা দেখিয়ে গ্রেফতার, এরপর টাকার বিনিময়ে মুক্তি। নিরীহ জনতার নাভিশ্বাস। দুঃখের বিষয় হচ্ছে এসব ঘটনার মূল অপরাধীকে কখনো শাস্তির মুখোমুখি করা হয় না। কক্সবাজারের রামু, পাবনার সাঁথিয়া কিংবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর ভোলার ঘটনা- সবর্ত্র একই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। যেই একটা অ-মানুষের কারণে এতগুলো মানুষ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হল তাকে দণ্ডিত না করে যদি পরবর্তীতে ধর্মীয় আবেগের বশবর্তী হয়ে অ্যাকশনে যাওয়া জনতার নামে মামলা করা হয়, তাহলে এটাকে বলা হবে ভেতরে ক্যান্সার রেখে বাইরে চর্মরোগের চিকিৎসা করা। আসল জায়গায় হাত না দিয়ে এভাবে সমাধানের আশা করা নিছক বোকামি।

ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম অবমাননাকে কেন্দ্র করে এসব সহিংসতায় যে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হিন্দু, সংখ্যাগুরু মুসলমান এবং সরকার- তিন পক্ষেরই দায়বদ্ধতা আছে। ইসলাম সহনশীলতার ধর্ম, মানবতার ধর্ম, ইনসাফের সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করার ধর্ম। ফলে এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদেরও তো কিছু কর্তব্য আছে। এসব কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং কোনো ধরনের কটূক্তি, উত্তেজনাকর বক্তব্য কিংবা আপত্তিকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকা।

আর আমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, নিজেদের দ্বীন-ঈমানকে যেমন দুষ্টদের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, ওয়ালা' বা'রা এর মাস'আলা মেনে চলতে হবে, তেমনি এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নিরপরাধ কোনো অমুসলিম যেন আমাদের হাতে জুলুমের শিকার না হয়। এই সীমাটুকু রক্ষা করার তালীম তো শরীয়ত আমাদের যুগ যুগ ধরে দিয়ে আসছে। তাছাড়া এদের অনেকেই যে তিলকে তাল বানাতে পারঙ্গম তা-ও তো স্মরণে রাখা দরকার। এই তো কয়েক বছর আগের কথা, বিবিসি সংবাদ দিল যে, ভারতে খোদ হিন্দুরাই বাছুর মেরে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছিল।

ঘটনাটি ভারতের উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলার। জেলার পুলিশ সুপার উমেশ কুমার সিংয়ের জবানিতে ঘটনার বৃত্তান্ত হচ্ছে, শনিবার রাতে কাটরা বাজার এলাকার একটি গ্রাম থেকে দুটি বাছুর চুরি হয়ে যায়। পরে বাছুর দুটোর গলা কেটে ফেলে রাখা হয়। কিন্তু স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মঙ্গল ও রামসেবক নামক দুজনকে ঘটনাস্থল থেকে পালাতে দেখে ফেলে। তারা গিয়ে মরা বাছুর দেখে পুলিশে খবর দেয়। সোমবার দুজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। মরা বাছুর দুটির ফলে সাময়িকভাবে এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল বলেও স্বীকার করেন পুলিশ সুপার। তিনি আরো বলেন, অনেক পুলিশ পাঠাতে হয়েছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে। দুজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৫ অক্টোবর, ২০১৭)

এই রকমের ঘটনা আমাদের দেশেও তো ঘটেছে। নিজেরা মূর্তি ভেঙে নালিশ দায়ের করার ঘটনা বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে। এই যাদের চরিত্র তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা তো অনেক বেশি প্রয়োজন। রাষ্ট্র যারা পরিচলনা করেন সাম্প্রদায়িক সংঘাতে হতাহতের দায়ভার তাদের ওপরই সবচেয়ে বেশি বর্তায়। ধর্ম অবমাননাকারীদেরকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদাসীনতা আমাদের প্রবলভাবে পীড়া দেয়। অভিযোগ আসার সাথে সাথে অপরাধীকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দিলেই তো সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়! সরকারের কিছু মন্ত্রীকে টেকো মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে শোনা যায়, 'বিশেষ একটা মহল (!) মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' সব জায়গায় তারা 'বিশেষ মহলে'র গন্ধ পান। কথা হচ্ছে অপরাধীকে সময়মত শায়েস্তা করলে তো তারা এই সুযোগটা পায় না! এই কাজে গড়িমসি করে আপনারাই তো 'বিশেষ মহল'কে মানুষের আবেগ পুঁজি করার সুযোগ করে দিচ্ছেন!? রংপুরের ঘটনায় দাদাবাবুদের দেশ ভারতের মায়াকান্না দেখে আমাদেরও চোখে জল এসে পড়েছে। বাংলাদেশে বিগত পাঁচ/সাত বছরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার মাত্র কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। আর ভারতের খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে সেখানে প্রতিদিন গড়ে তিনটি করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ভারত আর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের রূপ-প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন মানে মূর্তির ভাঙ্গা মাথা কিংবা কয়েকটা পোড়া ঘরবাড়ি। পক্ষান্তরে ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন মানে ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদে ১০ লক্ষ মুসলিম হত্যা, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দিয়ে ভারতজুড়ে লাখ লাখ মুসলিমের রক্ত নিয়ে হোলিখেলা, ২০০২ সালে মোদি-আদভানিদের প্রত্যক্ষ মদদে মহাত্মা গান্ধীর এলাকা গুজরাটে গণহত্যা আর বর্তমান চলমান নির্যাতনের ঘটনা তো আছেই। অপরদিকে যুগ যুগ ধরে চলছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করা। ভারতের জনৈক আলেম অত্যন্ত আফসোস করে বলেছিলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে সারা ভারতে হিন্দুদের হাতে লাখ লাখ মুসলিম নিহত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই অপরাধে একজন হিন্দুরও মৃত্যুদ- হয়নি।" সুতরাং নিরীহ মানুষের ছোপ ছোপ রক্তে যেই ভারতের চেহারা বীভৎস হয়ে আছে তারা যদি বিশ্বের কোথাও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে, মুরুব্বী সেজে নির্দেশনা দিতে আসে তবে তা যথেষ্ট পরিমাণে কৌতুক উৎপাদন করবে। নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে যে অন্যের বাড়ির আগুন নেভাতে দৌড়ঝাঁপ করে সে স্বার্থবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারত হোক আর বাংলাদেশ, হিন্দু হোক আর মুসলিম- সংখ্যালঘু নির্যাতন সবখানেই যেমন অন্যায়, তেমনি এক ধর্মের অনুসারী হয়ে অন্য ধর্মকে অবমাননা করাও মারাত্মক অপরাধ। এতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয় এবং বহু নিরপরাধ মানুষের জান-মাল হুমকির মুখে পড়ে। অতএব এসব ক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। আর তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে ইসলমী খেলাফতের মাধ্যমে, যা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জিহাদ ফি-সাবিলিল্লার বিকল্প কিছু নেই।

মুহতারাম পাঠক ! পরিশেষে আমি বলব, আসুন এসকল হিন্দু-মালাউন, গেরুয়া সন্ত্রাসীদের ছোবল থেকে উম্মতে মুসলিমার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের জন্য গযওয়ায়ে হিন্দের কাফেলাকে শক্তিশালি করি, এবং তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গযওয়ায়ে হিন্দের কাফেলাভুক্ত হয়ে জিহাদের পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন এবং মুজাহিদীনদেরকে সবখানে সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ চলবে...

আমীরুল মুমিনীন
শাইখুল হাদিস হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ

কর্তৃক প্রদত্ত মুজাহিদীনদের প্রতি বিশেষ নসিহত

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন নববী হিদায়েতের আলোকে এই বিষয়টি বুঝেছিলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে সকল মুসলমানকে ইজ্জত ও সম্মান প্রদানের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। জিহাদ মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনকে অবমাননা ও ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। কেননা, ইজ্জত-সম্মান রয়েছে আল্লাহর দ্বীনের মাঝে, আর প্রকৃত ইজ্জত-সম্মানের উপযুক্ত একমাত্র মুসলমানগণই। অপরদিকে জিল্লতী ও অপমান-অপদস্থতার উপযুক্ত কাফের ও মুনাফিকরা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ

অর্থ: "আর মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না (যে, সম্মানিত কারা আর অসম্মানিত কারা)"। (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থ: "যদি তোমরা বাস্তবেই মুমিন হয়ে থাক, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে"। (সূরা আল-ইমরান ৩; ১৩৯)

সতর্কতা: আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সম্মান ও সফলতা ঈমানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। কেননা, যার (প্রকৃত) ঈমান রয়েছে, সে সর্বাবস্থায় সফল ও সম্মানিত হবে। মুসলমান যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়ে আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়া নিয়ে মগ্ন ও ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন তার ওপর ভয়, লাঞ্ছনা ও এই জাতীয় অন্যান্য মুসিবত চেপে বসবে। যেমনটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা বাইয়ে 'ঈনা (এক প্রকার সুদী কারবার) করতে থাকবে, গরু-গাভীর লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন লাঞ্ছনা ও অবমাননা তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের (জিহাদের) ওপর ফিরে আসো"। যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ করে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হবে, তার ওপর নেফাকীর ভয় রয়েছে। যেমনটা হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম-৪৮২৫ - ই.ফা. ৪৭৭৮, ই.সে. ৪৭৭৯)

তাঁরাই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, যারা জিহাদ করেছেন। ফলে এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে শুধু বিভিন্ন রকম ইজ্জত-সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছেন তাই নয়; বরং তাঁদেরকে নানারকম সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। [সুরা আনকাবুত ২৯:৬৯]

বস্তুতঃ জিহাদ একটি দায়েমী ইবাদত, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

হযরত জাবের বিন সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "এই দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর একে প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করতে থাকবে"।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের কোন না কোন দল সর্বদা সত্যকে হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য লড়াই করতে থাকবে। যে কেউই তাদের সাথে দুশমনি করবে, তারা তার ওপর বিজয়ী থাকবে। এমনকি এই উম্মাহর শেষ ব্যক্তি মাসীহে দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে"।

অনুবাদ - মাওলানা সাইফুল ইসলাম ('নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ' ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর-২০১৯ সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

স্বাধীনতার লড়াই

কী, কেন এবং কীভাবে?

শাইখ মুহাম্মদ মাকবুল হাফিযাহুল্লাহ

(জম্মু-কাশ্মীরে "আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ" এর সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর রাহের একজন মুজাহিদের 'শরীয়ত কিংবা শাহাদাত' এর মানহাজ সংক্রান্ত আলোচনা)

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ (১) حَكِيمًا (৩) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (২) خَبِيرًا

অর্থ:"হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথায় চলবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যে ওহী পাঠানো হচ্ছে তার অনুসরণ করুন। তোমরা যা কিছু করোআল্লাহ নিশ্চিত ভাবে সে সম্পর্কেঅবগত এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখুন। কর্ম বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট"। (সুরা আহযাব৩৩ : ১-৩)

আমি কাশ্মীরে "আনসারে গাজওয়াতুল হিন্দের" সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি কেন? আমি কেন এরকম উঁচু হিম্মতওয়ালা এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এবং তাদের বিধি-বিধানকে মোহাব্বতকারী ঐসকল মুজাহিদীনদের কাফেলাকে পছন্দ করেছি, সর্বোপরি তাতে কেন আমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছি – সেবিষয়টিআপনাদেরকাছে খোলাসাকরবোইনশাআল্লাহ।

আমি বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলাম।কুরআন মাজীদ হিফজ করা থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত বেশ কিছু মাদরাসায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শআমারদেখাহয়ে ছিল।পড়ালেখারপাশাপাশি জিহাদের দিকেও দৃষ্টি রাখছিলাম।

প্রথম থেকেই এই ফিকির ছিল যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তার রাস্তা তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য কবুল করবেন।কারণ শুধু কিতাবের মধ্যেই মন পড়ে থাকত না বরং ইলমে দ্বীন শিক্ষার পাশাপাশি এই চিন্তাও হতো যে, কিভাবে জিহাদী কাজের জন্য উপযুক্ত হতে পারি।

সে সময়গুলোতে আমি কয়েকটি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম।কিন্তু অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে আহ্বান ও মানহাজের দাওয়াত বুরহান ওয়ানী এবং জাকির মূসা ভাই দিচ্ছিলেন, যদি কোন ভাবে সেই দাওয়াত ও জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতাম! এর কারণ, আজ পর্যন্ত যত স্লোগান শুনেছি তা থেকে সেগুলো ভিন্ন ছিল।

হঠাৎ রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যশীল, দ্বীনের মোহাব্বতকারী নেতাএবংএকজন মুজাহিদের স্লোগান ও আওয়াজ আমার কানে আসে। যিনি অন্য সকল স্লোগানের পরিবর্তে হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাতের স্লোগান দিলেন। এই স্লোগান আমার অন্তরকে জয় করে নিল।কেননা জিহাদের ব্যাপারে যত হাদিস শ্রবণ করেছি এবং মুজাহিদদের যে সমস্ত গুণাবলী জেনেছি, সে সকল গুণাবলী এবং হাদিস সমুহের বাস্তব নমুনা এই মুক্তি পাগলের মাঝে পাওয়া গিয়েছিল। এটা আমার জন্য বিশাল আনন্দের বিষয় ছিল।

এরপরআমিখুবপেরেশানহয়েগিয়েছিলাম যে, এখন আমি কি করতে পারি? যদি আমি হক্ক ও সত্যের আহ্বানে সাড়া না দিতে পারি তাহলে কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কীভাবেদাঁড়াবো?

প্রায় সময় এ কথা মনে হত যে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আমার জন্য অসম্ভব।তাই একদিন আসরের পর দু'আ করছিলাম, "হে আল্লাহ! আপনি সকল বিষয়ে সক্ষম।যেকোন ভাবে আপনি আমাকে আপনার মুজাহিদ বান্দাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিন"। তখনওসন্ধ্যা হয়নি, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করে ফেললেন। একটি মাধ্যম - যার মাধ্যমে আমি পূর্ব থেকেই চেষ্টা করছিলাম, সেখান থেকে হঠাৎ উত্তর এসে গেল।জাকির মূসা ভাইয়ের সহযোগীরায়হান খান ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগ হয়ে গেল।

আমার একজন ঘনিষ্ঠ সাথী যার দৃষ্টিভঙ্গিও এরকমই ছিল,তাকে আমার এ অবস্থার কথা জানালাম।আমি তাকে বললাম, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এখন আর কোন টেনশন নেই। যখন আমি তাকে বললাম যে, জাকির মূসা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হয়ে গেছে, তখন সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। যখন কিছুটা আশ্বস্ত হল তখন সেও অনেক খুশি হল। এভাবেই আমি কার্যতঃ গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

রায়হান খান ভাইয়ের সাথে কথা চলছিল।একদিন আমি ভাইকে বললাম, 'হযরত! একটি কথা বলুন।জাকির ভাই পাকিস্তানি সংস্থার সাথে কেন প্রকাশ্যে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েছেন?'রায়হান ভাই বললেন, 'ভাইজান! আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরের এ জিহাদকে পাকিস্তান সরকার এবং সংস্থাগুলো থেকে স্বাধীন করা'। এখানে এ বিষয়টিও জানা প্রয়োজন যে, 'জিহাদেরস্বাধীনতা' দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

'জিহাদের স্বাধীনতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ এমন কোন সংস্থা বা কোন সরকারের অধীনে করা যাবেনা, যে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়ার অধীনে না থাকবে। 'জিহাদের স্বাধীনতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার সমস্ত আইন এবং সংস্থা থেকে স্বাধীন হয়ে আল্লাহর শরীয়াহর বিধি-বিধানের গোলাম হয়ে জিহাদ করা। 'জিহাদের স্বাধীনতা' হলো আল্লাহ তা'আলার শরীয়াহর গোলামির ঐ শিকল, যা দুনিয়ার সকল শিকল থেকে মুক্তি দেয়।

'জিহাদের স্বাধীনতা'র উদ্দেশ্য হলো, কোন দেশ অথবা সংস্থা প্রসূত পররাষ্ট্র অথবা প্রক্সি যুদ্ধের(Proxy War)অংশ না হওয়া। 'জিহাদের স্বাধীনতা'র মাকসাদ হলো শরীয়াহর বিচার ব্যবস্থা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।
'জিহাদের স্বাধীনতা' যা ন্যাশনালিজম, সেকুলারিজম, কমিউনিজম, স্যোশালিজম এবং সর্বপ্রকার স্বজনপ্রীতি থেকে স্বাধীন। 'জিহাদের স্বাধীনতা' এমন এক প্রচেষ্টার নাম যার পরিণতি "জয় হিন্দ, জয় পাকিস্তান, কিংবা জয় বাংলার" স্লোগান নয়, বরং দারুল ইসলামের বরকতময় পরিবেশ তৈরি করা।

আমরা বুঝেছি যে, ঐ সকল সংস্থার হুকুম মানা থেকে অস্বীকার না করা এবং তাদের অধীনতা থেকে মুক্তির ঘোষণা না দেওয়ার কারণে, সত্তর বছরের অধিক সময় চলে গিয়েছে কিন্তু আমরা এই জটলা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। আমরা দেখেছি সত্তর বছরেরও অধিক সময় হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু আজও আইন-কানুন সেই ইংরেজদেরই রয়ে গেছে।

সুতরাং এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, গতকালের ইংরেজ শাসক "সাদা" ছিল, যারা আজকের ইংরেজ শাসক "কালো" হয়ে এসেছে। তারা সত্তর বছর পর্যন্ত শরীয়াহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি বরং শরীয়াহ বিরোধী যুদ্ধের দিকে আহ্বান করেছে। তাদের অধীনে জিহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্যহল - শত্রুকে প্রতিহত করা। তথা কুফরির প্রত্যেক এমন শক্তি ও সামর্থ্যকে ধ্বংসকরে দেওয়া যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিপদজনক।সেইসাথেপৃথিবী থেকে কুফরি আইনকে মিটিয়ে আল্লাহ তা'আলার কালিমাকে উঁচু করাও কুফরির সকল শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া। এটা কোন পররাষ্ট্র নীতি বা প্রক্সি যুদ্ধ নয়।এরপরআমিএ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতেপেরেছি যে, সংস্থাগুলোর অধীনতা থেকে বের হওয়ার ঘোষণা দেওয়া কতটা জরুরি ছিল।

এসকল সংস্থাগুলোই নিজেদের স্বার্থে, যখন প্রয়োজন হয় তখন বর্ডার খুলে দেয়।আর যখন নিজেদের স্বার্থ না থাকে,তখনগত বিশ বছরেরইতিহাসসাক্ষী তারা কাশ্মীরের মুজাহিদীনদেরকে একাকী ছেড়ে দিয়েছে। তারা মুজাহিদীনদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার মাঝে কোন কমতি করেনা।এমনকি তারা নিজেরাই কিছু মুজাহিদকে এই উপত্যকায় শহিদ করে দিয়েছে, আর কিছু মুজাহিদকে তাদের লোকেরা রাস্তায় মেরে ফেলেছে।

যাই হোক, আমি রায়হান খান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক হওয়ার ঘটনা বলছিলাম।তিনি আমাকে বললেন,'আপনি ইলমে দ্বীন শিক্ষার সনদ পরিপূর্ণ করুনএবং এই মানহাজের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কিতাবাদি পড়ে নিন'। যখন আমি এই বিষয়ে কিতাব পড়া শুরু করলাম তখন আমার মাথায় একটি কথা চক্কর দিচ্ছিল যে, এসকল বিষয়কে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তাই আমি রায়হান ভাইকে বললাম, 'আমাকে অতিদ্রুত জিহাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে নিন'। রায়হান ভাই অন্তর বিদীর্ণকারী একটি উত্তর দিয়েছিলেনযে,'ভাই! আপনি জেনে থাকবেন যে, একজন বন্দুকদারীর ভাইয়ের সাথে তিনজন পিস্তল ওয়ালা থাকে, কারণ আমাদের অস্ত্র অনেক কম। ইনশাআল্লাহ! আপনি পেরেশান হবেন না, অচিরেই অস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আপনিও অংশগ্রহণের

সুযোগ পেয়ে যাবেন'। আলহামদুলিল্লাহ! অতঃপর এমন দিন চলে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে আমিও জিহাদের ঐ কাতারে শামিল হয়ে গেছি।

ভাই আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু এই যে, হয়তো আমাদের প্রচেষ্টা ফলদায়ক হবে এবং শরীয়ত আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, অথবা শাহাদাত পেয়ে যাব এবং আমাদের ভাই বুরহান ওয়ানী, মুফতি হেলাল, সাজ্জাদ গালকার, আবু দুজানা, সবজার আহমাদ বাট, জাকির মূসা, রায়হান খান, আব্দুল হামীদ আল মাহেরী ও হাজার হাজার মহান ব্যক্তি এবং মুজাহিদদের সাথে জান্নাতে পৌঁছে যাব। আমাদের তামান্না হলো দুনিয়াতে ইসলামী কানুন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাক। আল্লাহ তা'আলা তার অনুগত বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন, ঐ সময় পর্যন্ত কাফেরদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না কুফরের ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার কালিমা সব থেকে উঁচু হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলাইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: "(হে মুমিনগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তো তাদের কার্যাবলি সম্যক দেখছেন"।(সুরা আনফাল ৮:৩৯)

জম্মু ও কাশ্মীরের আমার ভাইয়েরা!
আপনি যে দলেই থাকুন-না কেন। আল্লাহর শপথ! আপনারা আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। এমন কোন হতভাগা আছে কি, যে নিজ ভাইদের জন্যও নিকৃষ্ট চিন্তা করতে পারে? আমাদের অন্তরে আপনাদের জন্য কোন কষ্ট নেই বরং মোহাব্বত, সম্মান এবং কল্যাণকামীতা রয়েছে।

আমাদের চিন্তা তো একটাই যার ফলে আমাদের অন্তর সর্বদা পেরেশান থাকে।আর তা হলো, আমাদের কোন প্রচেষ্টা এবং শাহাদাত যেন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মিশন বা উদ্দেশ্যে না হয়।

কাশ্মীরের সম্মানিত মুজাহিদীন!
আপনারা এটা মনে করবেন না যে, আমাদের অন্তরে স্বজনপ্রীতি আছে! স্বজনপ্রীতি তো অন্যদের মাঝে কল্যাণ এবং সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে। আমাদের লক্ষ্য নিজেদের মধ্যে যে কমতি রয়েছে তা যেন দূর করতে পারি।

সত্য কথা হলো, আপনাদের কুরবানিই আমাদেরকে জিহাদ চিনিয়েছে। আপনাদের বিরত্বপূর্ণ এ'লান দ্বারা উত্থিত জিহাদের আজানই আমাদেরকে জিহাদে শরিক হতে সাহায্য করেছে। এ উপত্যকার এক একটি চূড়া আপনাদের সম্মান এবং ত্যাগসমূহের সাক্ষ্য হয়ে আছে। আমাদের স্বর্ণের ন্যায় জাফরানের এক একটিপাত্রের মাঝে শহিদদের রক্তের ঘ্রাণ রয়েছে। জম্মু এবং কাশ্মীরের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেকটি শহরে আমাদের এবং আপনাদের প্রবাহিত রক্ত রয়েছে। টর্চার-সেলে আমাদের ভাইদের আর্তনাদ এবং ফুঁপিয়েফুঁপিয়েকান্নাই- আমাদেরকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমরা একথা জানি যে, প্রত্যেক মুজাহিদেরই উদ্দেশ্য হলোআল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে বিজয়ী করা, হিন্দুদের অধীন থেকে আজাদী এবং আল্লাহর রাহে শাহাদাত। কিন্তু হে আমার ভাই! এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য পন্থাও তো সে অনুযায়ী হতে হবে! ভেবে দেখুন, আপনি দিল্লি যেতে ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু আপনি আগ্রার গাড়িতে উঠেছেন। তাহলে বলুন আপনি কি দিল্লি পৌছতে পারবেন? কখনো নয়! দিল্লি যাওয়ার জন্য আপনাকে দিল্লির গাড়িই ধরতে হবে। আমাদের দাওয়াত শুধু এটাই যে, নিজেদের জিহাদকে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাতলানো পদ্ধতিতে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাএবং আমাদের মাজলুম ভাই-বোনদের সাহায্য করা। বার্মা থেকে আগত আমাদের মা, বোন ও কন্যাদের হৃদয়বিদারক চিৎকার,আসামের ক্যাম্প গুলোতে আবদ্ধ কালিমা পাঠকারীদের আর্তনাদ;আহমেদাবাদ, গুজরাট, মুজাফফরনগর ও বর্তমানে দিল্লিতে পুড়েযাওয়ামুসলিম ভাইদের লাশসমূহ এবংকাশ্মীরেরকয়েকপ্রজন্মের শাহাদাত, বন্দীগণ, ধর্ষিতা বোন, ছড়রা গুলির আঘাতে ছিনিয়ে নেওয়া চোখের আলোএবং এতিমদের বুকফাটা আর্তনাদ- এসব আমাদেরকে আহ্বান করছে।

তাদের আহ্বানজিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আমল, যা শুধু আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধি-বিধানের অনুসরণে হবে; অন্য কারো পলিসির অধীনে হবে না। সুতরাং প্রয়োজন হলো, আমরা কাপুরুষতা ছেড়ে, হিম্মত করে, কাফেরদের চাপ না নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কার্যকরীপথে এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বুঝে আজাদীর এ মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। হে আমার জাতির যুবকগণ! আল্লাহ তা'আলার এ বানীর দিকে আসুন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থ:"(হে মুমিনগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়"।(সুরা আনফাল ৮:৩৯)

লাব্বাইক বলে সর্বোত্তম শহিদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।শহিদ গাজি বাবা, শহিদ বুরহান ওয়ানী ওশহিদজাকির মূসা রহি. এর স্বাধীনতার পতাকাকে এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পতাকাকে উঠিয়ে নিয়ে জিহাদের বরকতময় কাজে শরিক হয়ে যান। বিশ্বাস রাখুন এই স্বাধীনতা কোন মূল্য আদায় করা ছাড়া অর্জিত হবেনা। আর এই স্বাধীনতার মূল্য হলো রক্ত;তার মূল্য হলো মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যুকে ভয় করতে, অথবা এই মৃত্যুকে মৃত্যু বলতে আমাদের রব নিষেধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন,

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলনা, তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না"।(সুরা বাকারা ২:১৫৪)

আবার কোথাও এরশাদ করেছেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না, তারা মৃত নয় বরং তারা আল্লাহর নিকট জীবিত এবং তাঁর নিকট তাঁরা রিজিক পাচ্ছে"।(সুরা আল- ইমরান ৩:১৬৯)

অন্য আরেক স্থানে এরশাদ করেন,

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। [সুরা আল-ইমরান ৩:১৫৭]

অর্থাৎ প্রত্যেক কুফর, জুলুম, সাম্রাজ্য ও তাগুত থেকে স্বাধীনতার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহএরপথে শাহাদাত অথবা মৃত্যু পাওয়া তোমাদের জন্য অনেকউপকারি। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দান এবং রহমত নসীব হয়। আর আল্লাহ তা'আলার দান ও রহমত ঐ সকল নেয়ামত থেকে অনেক উত্তম, যে সকল নেয়ামত মানুষ আগ্রহের সাথে কামনা করে এবং জমা করে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাস্তবিক অর্থেবলেছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থ: (হে মুমিনগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তো তাদের কার্যাবলী সম্যক দেখছেন"।(সুরা আনফাল ৮:৩৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এর উপর আমল করারতাওফিক দান করুন। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করুন। সমস্ত মুসলমানদেরকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বাস্তবিক স্বাধীনতার বাগান দেখার তৌফিক দান করুন। আমীন। وما علينا الا البلاغ

অনুবাদঃ আহনাফ সাকের ('নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের এপ্রিল-২০২০ সংখ্যার ৮৬ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলনা, তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না"।(সুরা বাকারা ২:১৫৪)

কারা বন্দিদেরকে মুক্ত করা আমাদেরই দায়িত্ব

শাইখ আবদুল আজিজ আল-মুকরিন রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ: সালাহুদ্দীন

সমস্ত প্রশংসা মহান প্রভুর জন্য নির্ধারিত। দুরূদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যাকে সমস্ত পৃথীবির জন্য রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। এরপর সকল সাহাবির উপর দরুদ এবং সালাম প্রেরণ করছি।

দরুদ এবং সালামবাদ, মুসলিম বন্দিদের কথা চিন্তা করলে অন্তরটা কেঁপে উঠে। এসব নেককারদের কঠিন অবস্থার কথা স্বরণ করলে পাথরের মত হৃদয়ও গলে যায়। যাদেরকে আল্লাহ ইবাদাতের কারণে সম্মানিত করেছিলেন তারা আজ মূর্তি এবং ক্রুশ পূজারিদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। কিছু বানর, শুকর এবং স্বল্পসংখ্যক বিধর্মী এই অত্যাচার করছে। তাদের কাছে এই অপমানজনক অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না। তাদেরকে পূর্বের আমান বা শান্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং তাওহিদকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

আমেরিকান কারাগারে শায়েখ ওমর আব্দুর রহমান বন্দি ছিলেন। সেখান থেকে তিনি কোনভাবে মুক্ত হতে পারছিলেন না। বিশ্বের সমস্ত স্থান কেমন যেন সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। পাশাপাশি সময়ে কিউবায় আটশত মুজাহিদ যুবক গ্রেফতার হয়েছে। কাবুল, ফিলিস্তিন এবং বাগদাদে গাদ্দারদের হাতে সত্যবাদি যুবকদের বন্দি হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, পবিত্র ভূমি জাজিরাতুল আরবেরও কারাগারগুলো নেককার মুজাহিদ দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে। আর তাদের উপর আমেরিকা এবং তাগুতের বাহিনী লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। নিশ্চয় এসব কয়েদিরা অনেক বড় পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে যতক্ষণ তারা ধৈর্যধারণ করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :-

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

তুমি বলে দাও -- "হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের প্রভুকে ভয়ভক্তি করো। যারা এই দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য ভাল রয়েছে। আর আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রসারিত। নিঃসন্দেহ অধ্যবসায়ীদের তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে হিসাবপত্র ব্যতিরেকে।" (সূরা ঝুমার – ১০)

তারা এই কষ্টের দ্বারা পরকালিন জীবনের ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে। যে সব ভয়াবহ পরিনতির সম্মুখিন হবে অন্যরা। আর এদের মুক্তির দায়ভার মুজাহিদিনদেরকেই নিতে হবে। যে সকল মুজাহিদগণ বন্দি হয়েছেন তাদের কাছে এ দুনিয়া হল ধোঁকার সামগ্রী। তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছেন। বিধায় বন্দিত্বের কষ্ট ভোগ করা তাদের কাছে কষ্টকর হয় নি।

কিন্তু মুসলিমদেরকে কিছু প্রশ্নের কথা ভুলে গেলে চলবে না - আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কি করেছি? যারা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য বন্দি হয়েছেন তাদের জন্য আমরা কি করেছি? এবং আমাদের দুনিয়া, দ্বীন ধ্বংসকারীদের জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিয়েছি?

সমস্ত মুসলমান এবং তাদের পরিবারের জন্য জরুরী হল - আনন্দ এবং লালসার পথে না চলে, কামনা-বাসনার পথে জড়িত না হয়ে, খারাপ পথ পরিহার করে জিহাদের পথে হাঁটা। মুজাহিদিনদের বাধাসমূহকে গুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে জিহাদ না থাকলে দুনিয়ায় ফাসাদ এবং নষ্টামি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেত, দুনিয়াটা কুফর-শিরকের আড্ডাখানায় পরিণত হত।

অতপর, ঐ সকল সৈন্য অফিসার এবং কয়েদি যুবক মুজাহিদদের দ্বায়িত্বশিল ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে মাসজিদুল হারামাইনের নগরিতে অনাচার সৃষ্টিকারিদের কথা আমরা ভুলব না। যতক্ষণ তারা আমাদেরকে হত্যা করবে আমরাও তাদেরকে হত্যা করতে উৎসাহিত হব। তাদেরকে প্রতিরোধ করা হবে আল্লাহর দ্বীন ও দুর্বল মুমিনদের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত।

এ ধরণের উৎসাহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করে বলেন :-

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

আর যারা তাদের প্রতি যখন বিদ্রোহ আঘাত হানে তারা তখন আত্মরক্ষা করে। (সূরা আশ-শুরা - ৩৯)

এসকল সৈন্য এবং অফিসারগণ নিজেরা স্বেচ্ছায় মুজাহিদদের সাথে ব্যর্থ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং আমেরিকা ও তার চেলা-চামুন্ডাদের স্বার্থে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। আর তাদের কর্মচারিদেরকে আল্লাহর সাথে কুফুরি করার জন্য আরো বেশি শক্তিশালি করছে। সৌদি আরব এবং অপরাধী আমেরিকার সাথে মুজাহিদিনদের এ যুদ্ধের ফলাফল একেবারে চুড়ান্ত এবং স্পষ্ট। কেননা মুজাহিদিনদের বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছেন। (এরপরও) কেন তাগুতের সৈন্যরা ধোকা খায়?!! তারা কেন কুফফারদের কাছে যায়?!! (আমার বুঝে আসে না)।

নিশ্চয় আমাদের প্রতি রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া কর্তব্য হল :-

فكو العانى

তোমরা বন্দিকে মুক্ত কর। (সহীহ বুখারী-২৯৫০)

আমাদের উপর এটা একটা বড় দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব অচিরেই আমরা পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ। আর সেদিন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্যে শান্তির মুখ দেখবে। আল্লাহ যাকে চান তাকে বিজয় দান করেন।

সমস্ত মুসলমান এবং তাদের পরিবারের জন্য জরুরী হল - আনন্দ এবং লালসার পথে না চলে, কামনা-বাসনার পথে জড়িত না হয়ে, খারাপ পথ পরিহার করে জিহাদের পথে হাঁটা। মুজাহিদিনদের বাধাসমূহকে গুড়িয়ে ফেলতে হবে।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর সাথে কিছুক্ষণ

(পর্ব – ৭)

মুঈনুদ্দিন শামী হাফিযাহুল্লাহ

সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরই আল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের মরণ দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবন ও মরণ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি দেখে নিতে পারেন যে, আমাদের মধ্য থেকে কে উত্তম আমল করে?

নোট: উক্ত আলোচনায় যেখানেই 'উস্তাদ' বা 'উস্তাদজী' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ 'শহীদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর সাথে কয়েকটি সাক্ষাৎকার। তার থেকে কিছু স্মৃতিচারণ করা। তাঁর কিছু কথা এমন ছিল যা বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে আন্দোলনের ঝড় তুলত। উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর জীবদ্দশায় তার প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে হয়তোবা গণ্য ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি আশাবাদী যে, তার শাহাদাতের পরে তার বন্ধুবরদের মধ্যে শামিল হবো। আল্লাহর ইচ্ছায়- যদিও তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর বন্ধুবরদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। উস্তাদের মোহাব্বতের উল্লেখ এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইনশা আল্লাহ্ – তিনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রিয়জনদের একজন ছিলেন। তিনি আমাদেরও প্রিয় ছিলেন এবং আমিও তার প্রিয় ছিলাম। আর এ ভালোবাসার সোনালি জিঞ্জির যা আল্লাহর দরবারে আলোচিত হওয়ার অন্যতম একটি পন্থা বা কারণ যার মাধ্যমে উস্তাদও আমাদের ভুলবেন না। ইনশা আল্লাহ্।

হযরত উস্তাদ (রহ.) এর সাথে আজ পর্যন্ত যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে তার সকল স্মৃতি ও কথাতো স্মরণে নেই, কিন্তু তার যতটুকু স্মৃতিতে এখনও সজীবতার সাক্ষ্য রেখে চলছে, তার পুরোটুকু কাগজের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। যা পরপারে ঘাটের কড়ি হিসেবে কাজে দিবে- ইনশা আল্লাহ্। আমি সহ যারা হযরত উস্তাদজী (রহ.) কে ভালোবাসেন তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সঠিক কথা, সঠিক নিয়তে ও সঠিক পন্থায় ব্যক্তকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

الحمد لله و كفى والصلاة والسلام على محمدٍ المصطفى. أللهم وفقني كما تحب و ترضى والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، آمين!

মিরানশাহ্ শহরে উস্তাদজী (রহ.) এর সঙ্গীবস্থার কিছু স্মৃতি

দাওরায়ে শরঈয়্যাহ্ শেষ হয়েছে মাত্র, তাই আমরা অন্যান্য জিহাদী কার্যাবলী ফিরে আসি। লেখকের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে মিরানশায় থাকাকালীন আমাকে কোন আনুষ্ঠানিক ব্যস্ততা ছাড়াই কিছুটা সময় কাটাতে হয়েছিল। সুতরাং এই সময়টি নিয়মিত ব্যস্ততা ছাড়াই চলে গেল এবং আমি মিরানশাহে বিভিন্ন কার্যক্রমে দেড় মাস থাকার সুবাদে উস্তাদ (রহ.) এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাই। সেই সময়ের কিছু স্মৃতিকথা যা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজ পাঠকের সামনে সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

উস্তাদজীর (রহ.) অনন্য নসিহত

একদিন লেখক উস্তাদজী (রহ.) দ্বারা পরিচালিত মাজমুয়ার (অতিথি ঘর) ওয়ারলেস যোগাযোগ পরিসেবা গুলির দায়িত্বে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি ওয়ারলেসে সংযুক্ত হয়ে একজনকে দিতে বললেন। আমি বললাম, 'তিনি এখন এখানে নেই'। ঐ ব্যক্তি পুনরায় চাইলে আমি আবারও পূর্বের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে?' সে উত্তরে বলল, 'আমি 'বাবা' এবং সেই সাথে তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে আমার সাথে পিড়াপিড়ি করা শুরু করল। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করে বললাম, 'আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে এই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না'। তবে উক্ত কথাগুলো বলার সময় আমার কণ্ঠে বিরক্তির সুর ভেসে ওঠে। তারপর 'বাবা' বললেন যে, 'আচ্ছা, তাহলে এখন রাখি। তিনি আসলে যোগাযোগ করতে বলবেন'। এভাবেই আমাদের কথা শেষ হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতেই হাসান ভাই, যিনি ঐ দিন উস্তাদজী (রহ.) এর সাহায্যের জন্য নিযুক্ত ছিলেন; তিনি আসলেন। এসে বলতে লাগলেন যে, 'উস্তাদজী (রহ.) আপনাকে ডেকেছেন'। আমি সাথে সাথেই চলে গেলাম।

উস্তাদজীর (রহ.) খেদমতে যখন পৌঁছলাম, তখন সালাম ও সংক্ষিপ্তভাবে হালত জিজ্ঞেস করে উস্তাদজী (রহ.) বললেন যে, 'এ কথা বুঝা গেল তো "বাবা" কে?' আমি তখন না-বোধক উত্তর দিলাম। আমার উত্তর শুনে উস্তাদজী (রহ.) বললেন, 'তিনি মুজাহিদে আ'যম মাওলানা কারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব ছিলেন'। এ কথা শ্রবণে সেই 'বাবা'র সাথে কথা বলার সময় আমার কণ্ঠে বিরক্তির সুরের বিষয়টি আমাকে খুবই লজ্জিত করল।

উস্তাদজী (রহ.) বললেন, 'যখনই কারো সাথে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়, সে যেই হোক না কেন! পরিপূর্ণ আদব এবং আন্তরিকতার প্রতি খুব-ই যত্নবান থাকা উচিত। বিশেষত: যখন কোন বড় মাপের লোক হয় সেখানে তো এ আদব বেড়ে যাওয়া অতীব জরুরী'। উস্তাদজী (রহ.) সংক্ষিপ্ত আকারে উপদেশ দিলেন, তারপর অভ্যাস অনুযায়ী মাথা নিচু করলেন, মুচকি হাসলেন এবং বললেন যে, 'এখন আপনি যেতে পারেন'।

শহীদ মাওলানা ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব (রহ.) এর কিছু উন্নত স্মৃতিচারণ!

মাওলানা ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব ছিলেন একজন বড় মাপের বুজুর্গ, দ্বীনের দা'য়ী এবং আল্লাহর রাস্তার অনন্য মুজাহিদ। তিনি পুরো যৌবনটাকে, বার্ধক্যের সময় এবং বার্ধক্যের পূর্বের সময় অর্থাৎ সারা জীবনটাকে দ্বীনের পথে হিজরত, জিহাদ, কিতাল, বন্দি হওয়া এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাটিয়েছেন। অবশেষে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইমারতে ইসলামিয়ার ভূমি আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের নওয়া জেলায় শহীদ হয়েছিলেন। ক্বারী সাহেব একজন বিদগ্ধ আলেমে দ্বীন ছিলেন এবং দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী ও আল্লাহর রাহে লড়াইরত একজন সৈনিক ছিলেন। হযরত ক্বারী সাহেব যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে অভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ইমারতে ইসলামিয়ার প্রথম দিকে বড় বড় সেক্টরের মুজাহিদ সৈনিকদের ট্রেনিং করাতেন এবং ১৯৯৬ সালের পূর্বের জিহাদে মুজাহিদদের ট্রেনিং দিতেন; যাকে 'জুনদুল্লাহ্ বা আল্লাহর সৈনিক' বলা হতো। যেভাবে তিনি স্বীয় জীবনের ঐশ্বর্য ও বীরত্বের সাথে জিহাদের পথে অবিচল থেকেছেন, ঠিক তেমনি ভাবেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তটাও চমৎকার ভাবে উৎসর্গ করেছেন। ক্বারী সাহেবের বাড়ির উপরে মার্কিন ও আফগান সামরিক কমান্ডো বিমান হামলা চালায়। তার শুভ্রতা মাখা দাড়ি তথা বার্ধক্য জীবনেও কাফেরদের সাথে লড়াই চালিয়ে যান এবং তার ক্লাসিনকোভও ততক্ষণ পর্যন্ত হাতছাড়া করেননি, যতক্ষণ না তার শরীর থেকে রূহ আলাদা হয়। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উক্ত শান অবস্থায় শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি অবারিত ধারায় রহমত বর্ষণ করুন। তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা এমনই, তবে প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

একটি মাসয়ালা

এভাবেই লেখকের মিরানশাহ শহরে কয়েকটি কাজ করতে করতে সময়ের কাঁটা অতিবাহিত হচ্ছিল। যেদিন দিনের বেলায় কোন কাজের রুটিন থাকত, সেদিন রাত প্রবাসের জন্য উস্তাদজীর (রহ.) খেদমতে হাজির হতেন এবং সকাল বেলায় ফজরের নামাজান্তে সেখান থেকেই কাজের জন্য বের হয়ে যেতেন। একদিন সকাল বেলায় আমি উস্তাদজীকে (রহ.) 'MSG (Monosodium Glutamate) যাকে সাধারণতঃ ছানা (টেস্টিং) সল্ট বলা হয়ে থাকে; এ খাবারের বৈধতা ও নিষিদ্ধতার ব্যাপারে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলাম। উস্তাদজী (রহ.) বললেন যে, 'তাহক্বীকের সাথে আমার জানা নেই, তবে এটা একটা সাধারণ জিনিস এবং আমার দৃষ্টিতে এর বিপরীত কোন বিদগ্ধ আলেমের রায় বা ফতোয়া পাওয়া যায় নি। যে এটার ব্যবহার করছে তাকে সঠিক মাসয়ালা না জেনে গালমন্দ না করা এবং অযথা এর প্রচলনেরও প্রয়োজন নেই'।

কথা শেষ হয়ে গেল। গোধূলি পেরিয়ে সন্ধ্যায় যখন রুটিন অনুযায়ী উস্তাদজীর (রহ.) কাছে পৌঁছলাম, সেখানে দরজার বাহিরে হাসান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'আজকে বেঁচে গেছি'। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কেন, কি হয়েছে?' তিনি বলতে লাগলেন যে, 'আপনি যে সকালে ছানা (টেস্টিং) সল্ট সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি যখন দুপুরে মেহমান খানায় গেলাম এবং মসলার ডিব্বা (কৌটা) থেকে রান্নার পাত্রে রাখতে ছিলাম, তখন এরই মাঝে উক্ত ছানা (টেস্টিং) সল্ট দেওয়া হয় যা সাধারণত মসলার ডিব্বাতে থাকত'।

‘যার ফলে তিক্ততা কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু উস্তাদজীকে (রহ.) এ ব্যাপারে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয়নি, কিন্তু আপনার সাথে সকালের সে মাসয়ালার কথা মনে পড়ে যায়। এবং বলেন যে, যা ব্যবহারের জন্য আমি বারণ করেছিলাম আর এখন সেটা সোজা মেহমান খানায় পৌঁছে গিয়েছে। সম্ভবতঃ (সকালে যিনি মাসয়ালা জানতে চেয়েছিলেন) সে এ কথাকে ছড়িয়ে দিয়েছে, সন্ধ্যায় আসুক, খবর নিয়ে ছাড়ব!’।

এ কথা বলে হাসান ভাই মুচকি হেসে পুনরায় বললেন, ‘আল্লাহর কৃপা যে আপনি সকালের ঐ কথা কাউকে বলেন নি’। এ কথা শুনে আমি খুব করে হাসতে লাগলাম। উস্তাদজীর (রহ.) ধমকের ভয় পাচ্ছিলাম সত্যি, কিন্তু তার ধমক এবং খবরাখবর নেওয়ার মাঝে (যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হতো) আমারও এক চামচ ছিল (অর্থাৎ উস্তাদজীকেও (রহ.) টেনে ধরতাম) বিশেষত যখন অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশে রসিকতা বা হালকা-মনে অবস্থান করতেন।

যাই হোক, আমি উস্তাদজীর (রহ.) কামরায় প্রবেশ করে সালাম দিলাম। উস্তাদজী (রহ.) স্বীয় কাজে এবং আমলের মাঝে ব্যস্ত ছিলেন। মাগরিব অথবা ঈশার পরে তার সাথে কিছু কথা বিনিময়ের সময় তিনি বলতে লাগলেন যে, ‘আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, হয়তোবা আপনি মেহমান খানায় সে কথা বলে ফেলেছেন কি-না; আল্লাহর শুকরিয়া যে, আপনি তা বলেন নি। তবে কথা হলো যখন কোন বিষয়ে অবৈধ বা হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) না হয়ে থাকে এবং কিছু উলামায়ে কেরাম তাকে হালাল বলতে থাকেন কিন্তু আমাদের নিকট সন্দেহ থাকে, তবে উচিত হলো নিজে তা থেকে বেঁচে থাকা তবে অন্যদের উপরে এটা বাস্তবায়ন না করা’।

এতটুকু কথা হওয়ার পরে তিনি ছানা (টেস্টিং) সল্টের ব্যাপারে তাহক্বীকের জন্য কয়েকটি জায়গায় যোগাযোগ করেন। এবং পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ কয়েকজন উলামা যথা: মুফতি ত্বাকী উসমানী সাহেব, মুফতি ইসমাঈল প্রমুখদের নিকট থেকে ছানা (টেস্টিং) সল্ট ‘হালাল’ হওয়ার ব্যাপারে সমাধান পেয়ে তবেই শান্ত হলেন।

অনুপম ক্ষমা প্রার্থনা

যাই হোক উপরে উল্লেখিত হালকা মন ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ক একটি ঘটনা স্মরণে চলে আসল, যে ঘটনাটি পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। “একদিন আমি মাগরিবের পরে উস্তাদজীর (রহ.) কামরায় বসে আছি। আমি আমার কম্পিউটারে উস্তাদজীর (রহ.) ‘হেদায়েতের প্রয়োজনীয়তা’ বিষয়ক একটি কাজে ব্যস্ত ছিলাম; এর মধ্যে উস্তাদজীও (রহ.) চলে এসেছেন। কথা বলতে বলতে আল্লামা ইকবালের আলোচনা উঠে আসল। সে সময় আমি নূন্যতম জ্ঞানের অধিকারী এবং অস্থির প্রকৃতির ছিলাম, তাই আমি বললাম যে, ‘আল্লামা ইকবাল তো ছোট এক কবি ছিলেন’। এ বিষয়ে উস্তাদজী (রহ.) আমাকে এমতাবস্থায় দেখে মাথাকে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, ‘কি ব্যাপার?!’। আমি বললাম ‘কেন কি হয়েছে!’ এবং আমার কথার দলিল হিসেবে বললাম যে, আল্লামা ইকবালের বক্তব্য হলো- ‘আমি আমাকে কখনো কবি মনে করি না, কিছু কথা আছে সেগুলোকে ব্যক্ত করার জন্য কবিতাকে মাধ্যম মনে করি’। এরপর এ ব্যাপারে উস্তাদজী (রহ.) বললেন যে, ‘আপনিও দুর্দান্ত কথা বলেন এবং তিনি তুলনামূলকভাবে এমন কিছু সরল কথা বলেছিলেন, যা আমাকে বোকা বানিয়ে দেয়’।

যখন উস্তাদজী (রহ.) বুঝতে পারলেন যে, উক্ত কথার মাধ্যমে আমার কষ্ট হয়েছে। আসলে সেখানে তেমন কোন কথা বলেন নি যা উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ কোন ব্যাপারই ছিলনা। যাতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি স্বাভাবিক হয়ে যাই। কিন্তু উস্তাদজী (রহ.) তীক্ষ্ণানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আরেকটা কথা হলো তিনি স্বীয় অনুভূতিকে নিজের উপর ছাড়া অন্যের উপর প্রয়োগ করতেন না। কিন্তু সাধারণতঃ আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্বের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং এটাকে প্রকাশও করতেন। তাই সাথে সাথে তিনি একটি কাগজ ও কলম নিলেন এবং কিছু লিখে আমার হাতে দিলেন। উক্ত কাগজে লেখা ছিল ‘আমি আপনার অন্তরে কষ্ট দিয়েছি, এ ব্যাপারে আমাকে মাফ করে দিন!’।

আমি এটা পড়ে আরো লজ্জিত হলাম। আসলে আমিতো পূর্ব থেকেই লজ্জিত হয়েছিলাম যে, আমি একটা বেহুদা কথা বলেছি।

এ ব্যাপারে আমি ওজর পেশ করি। উস্তাদজীর (রহ.) বিনয় ও ভালোবাসা এমনই ছিল যে, তার কোন তুলনাই হয়না। তাই সেখানে উপস্থিত অন্য সাথীদেরকেও তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, 'যদি কোন ছোট ভাই তার বড় ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহলে বড় ভাইয়ের কি করার আছে?' এ কথা শুনে এক সাথী বলল, 'ছোট ভাইকে কিছু মিষ্টি খাওয়ানো যেতে পারে'। উস্তাদজী (রহ.) সাথে সাথে উঠে গেলেন অথবা ঐ রাত্রেই বা পরের দিন কিছু মিষ্টি (সম্ভবতঃ কাস্টার্ড শিরিন দিয়ে তৈরি) নিয়ে এসেছেন। উস্তাদজীর (রহ.) প্রতি অঝোর ধারায় আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হোক। যিনি উত্তম চরিত্র এবং জিহাদী চিন্তা-ফিকির স্বীয় বন্ধু ও শিষ্যদেরকে হাতে-কলমে দেখিয়েছেন এবং যার চেষ্টা তিনি করতেন সেই প্রচেষ্টাকে আমাকে এবং অন্য সাথীদের প্রতি ব্যাপকভাবে দান করুন।

সব জিনিসের পিছনেই চক্রান্ত; বিষয়টি কি ঠিক?

অন্য একদিনের কথা- 'উইকিলিকস' এর প্রধান মুখপাত্র 'জুলিয়ান অ্যাস্যাঞ্জ' এর ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। তো আমি বললাম যে, 'সে কেন এতো গোপন তথ্য প্রকাশ করেছে? এর মধ্যে আবার কি চক্রান্ত রয়েছে?'। এ কথার উপর উস্তাদজী (রহ.) আমাকে বুঝাতে লাগলেন যে, 'প্রত্যেক জিনিসের পিছনে চক্রান্ত খোজার প্রয়োজন হয়না। আমাদের লোকদের মন-মানসিকতা এমন হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের পিছনের রহস্য উদঘাটনে লেগে যায় এবং সে রহস্য বের করেই কেবল ক্ষান্ত হয়। দুনিয়াতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের পেশা এবং কাজ বা যেমন চিন্তা-ভাবনা করে তাদের আকিদা বা বিশ্বাসও তেমনই হয়ে থাকে।

সুতরাং তার এ আকিদার জন্য এবং দুনিয়াতে যাকে গণতন্ত্র বা অধিকার বলে; আর সে অধিকারকে সংরক্ষণ করার জন্য তাদের যদি কখনো স্বীয় রাষ্ট্র বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে 'অধিকার' এর অধিকারের কথা সামনে আসে তখন তারা (রাষ্ট্রের) বিরুদ্ধেও কথা বলতে থাকে। দুনিয়াতে অনেক ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিটি জিনিস-ই ষড়যন্ত্র হয়না আর প্রতিটি কাজের পিছনেই 'ইয়াহুদীরা' ওঁত পেতে থাকে না। বিষয়গুলোকে এমন দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই দেখা উচিত তবে সব সময় না। বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে আসলকে দেখা উচিত। বাহ্যিকভাবে এ 'জুলিয়ান অ্যাস্যাঞ্জ'ও এমনই একজন ব্যক্তি এবং এটা বুঝেছে যে, এগুলো (গোপন তথ্য প্রকাশ করা) অধিকারের বিষয় তাই তিনি এ কাজ করেছেন। আর সে জন্য চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। যাই হোক এটাই মূল কথা, এর পিছনে চক্রান্ত না খোজা উচিত!'।

এই হলো মিরানশাহের কিছু স্মৃতিচারণ যা দু-চারটি ঘটনা ছিল। এরপরে আমি মিরানশাহ থেকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে যাওয়ার জন্য মধ্য ওয়াজিরিস্তানের দিকে রওনা হয়ে যাই। আর ওটাই উস্তাদজীর (রহ.) সাথে কয়েকটি মাসের মধ্যে বেশি সময় থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইনশা আল্লাহ্ বাকি কথা উস্তাদজীর (রহ.) আগামী মাহফিলে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমিন- ইয়া রব্বাল আলামিন।

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين و صلى الله عى نبينا و قرة اعيننا محمد وعلى أله و صحبه ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين–

[চলবে, ইনশাআল্লাহ্]

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান ('নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের এপ্রিল-২০২০ সংখ্যার ৬৫ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

দুনিয়াতে অনেক ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিটি জিনিস-ই ষড়যন্ত্র হয়না আর প্রতিটি কাজের পিছনেই 'ইয়াহুদীরা' ওঁত পেতে থাকে না। বিষয়গুলোকে এমন দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই দেখা উচিত তবে সব সময় না। বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে আসলকে দেখা উচিত।

বড় জামাত কী?

মূল: হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহিমাহুল্লাহ
সংকলন ও সংযোজন: মাওলানা মুহাম্মদ মুসান্না হাফিযাহুল্লাহ

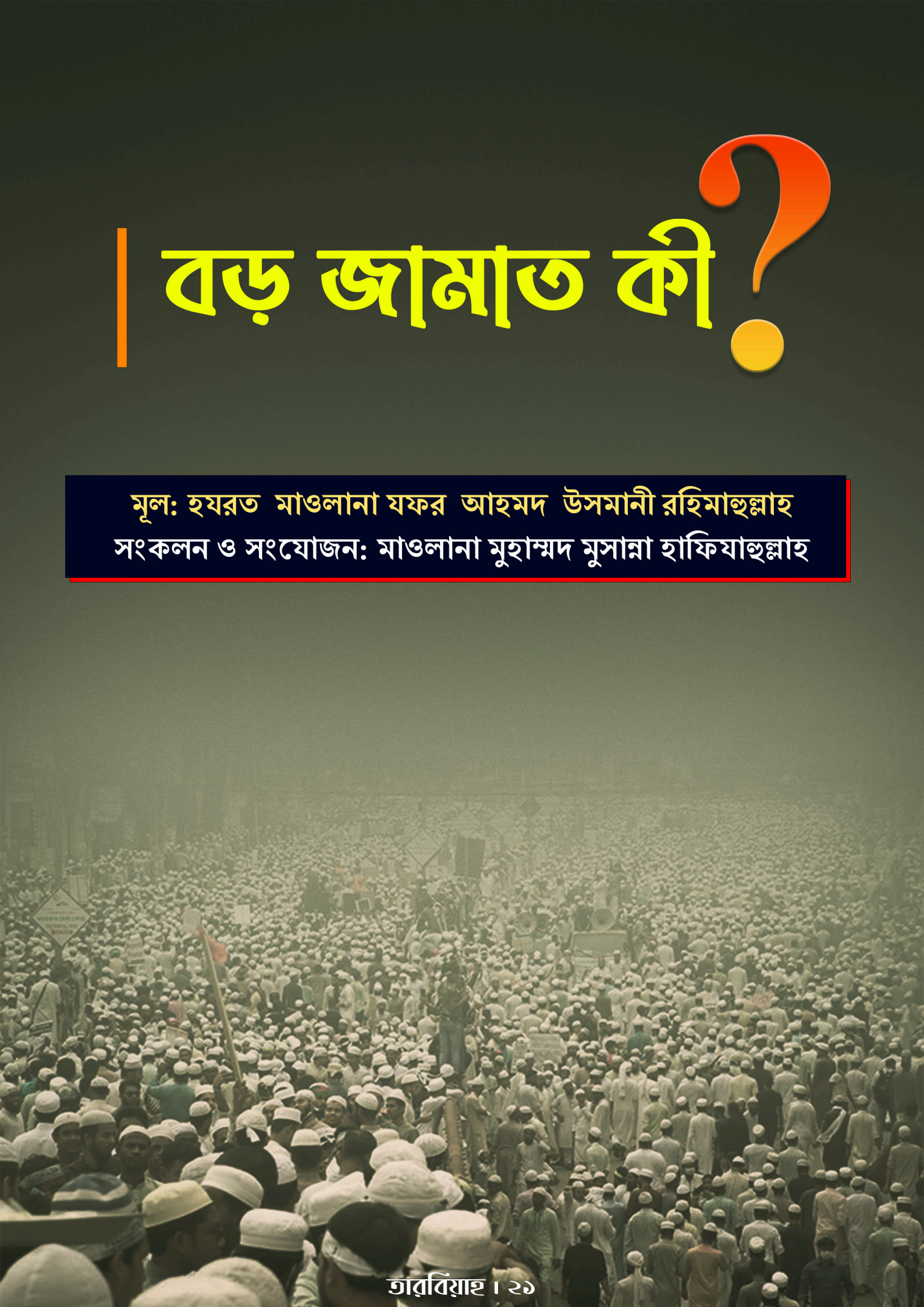

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী'ابتغوا السواد الأعظم'-কে ভিত্তি করে একথা ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে যে, সংখ্যাধিক্যতাই হলো হক্কের মাপকাঠি, শরয়ী মাপকাঠির দিকে লক্ষ করা ছাড়াই একথা বলা গলত।

'এয়লাউস সুনান' কিতাবের লেখক মুহাদ্দিস, ফকীহ আল্লামা যফর আহমদ উসমানী সাহেবের একটি লেখা আপনাদের খেদমতে পেশ করছি; যাতে পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হক্কপন্থী যত কম হোক না কেন তার সাথে থাকাই হলো 'سواد الأعظم'এর সাথে থাকা। আর বাতিলপন্থী যত বেশিই হোক না কেন তাদের সঙ্গ দেওয়া হলো জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও মিথ্যা মতবাদের অনুসরণ করা।

মূলকথা হলো, আমাদেরকে দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে হক্কপন্থী আলেমদের অনুসরণ করতে হবে;গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়। আবার আলেমদের অনুসরণের ক্ষেত্রেও শরয়ী মানদণ্ড খেয়াল রাখতে হবে। কেননা এক্ষেত্রেও অন্ধঅনুসরণ আমাদের জন্য কোন সফলতা বয়ে আনবে না। লেখাটি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহঃ এর তত্ত্বাবধানে রচিত 'ইমদাদুল আহকাম' থেকে সংগৃহীত, যা আমাদের সাথী মাওলানা মুহাম্মদ মুসান্নাহ (হাফিজাহুল্লাহ) নতুন কিছু হাওয়ালা সংযোজন করে নতুনভাবে বিন্যস্তকরেছেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُوقال في تنقيح الرواة وله شاهد عند الحاكم، في المستدرك عن أنس باسناد حسن وعند أبي داود وأحمد والحاكم عن ابن عمر، وعند الديلمى عن معاذ، وتعدد الطرق يشد بعضها بعضا، ثم قال صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما هو في الحديث رأيناه في زماننا هذا وإلى الله المشتكى.

আলী ইবনে আবী তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"অচিরেই এমন একটা সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, কুরআনের অক্ষরগুলো ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, মসজিদগুলো থাকবে উন্নত/সমৃদ্ধ কিন্তু তা হেদায়েত-শূন্য হবে, পৃথিবীর বুকে তখন আলেমরাই হবে সর্বনিকৃষ্ট, তাদের থেকেই ফেতনা উদ্ভাবন হবে"। (শুআবুল ঈমান ৩য় খণ্ড, ৩১৮নং পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদিসটি অন্যান্যদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বাইহাকী রহঃ এই হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন –

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন। আর আমরা বর্তমান যুগে তার বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছি। হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, একটা সময় উলামায়ে কেরামের নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে, আর এদের সংখ্যাই বেশি হবে। কারণ সর্বযুগে কোন একটি ছোট দল হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি অন্য হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। এহেন পরিস্থিতিতে কোন একটা মাসআলার উপর অধিকাংশ আলেমের ঐক্যমত হওয়া ঐ মাসআলা সঠিক হওয়ার দলিল নয়।

قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

এরবাজ ইবনে সারিয়াহ রাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,"আমি তোমাদের আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং (নেতার আদেশ) শ্রবণ ও মান্য কারার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশি ও ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে দূরে থাকবে; কেননা তা গোমরাহি। তোমাদের মধ্যে কেউ সেই যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাহ ও সৎ পথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের সুন্নাহতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর"।

(তিরমীযী শরীফ: ৪র্থ খণ্ড, ৩৪১ নং পৃষ্ঠা)

এই হাদিসের মধ্যে উল্লেখিত ‘الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ’ এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, তারা হলেন চার মহান খলিফা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক হাদিসে বলেছেন,

‘আমার পরে ত্রিশ বছর অবধি (নবুওয়্যাতি) খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে’।

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যখন উম্মতের মাঝে মত-বিরোধ দেখা দিবে, তখন তাদের জন্য আবশ্যক হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করা। অনুসারীদের সংখ্যা বিবেচ্য নয়। একজনও যদি সুন্নাতের অনুসরণ করে (আর সমস্ত মানুষ তার ক্ষতি করতে উঠেপড়ে লাগে) তবুও তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অন্য যে হাদিসগুলোর দলিল “বড় জামাত কি?” এই প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.(ورواه سنن أبي داود في كتاب الأقضية، باب أجتهاد الرأي في القضاء، وغيرهما مثل هذا الحديث أيضا، ورجاله ثقات، الأحرث بن عمروا في المغيرة بن شعبة مختلف فيه، ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه آخرون، كما يظهر من التهذيب ج ٢، ص٢.)

“হযরত মুআয (রাঃ) এর সঙ্গীগণ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামান পাঠান। তিনি প্রশ্ন করেন,‘তুমি কীভাবে বিচার করবে?’তিনি বললেন, ‘আমি আল্লাহ তা’আলার কিতাব অনুসারে বিচার করব’। তিনি বললেন,‘যদি আল্লাহ তা’আলার কিতাবে পাওয়া না যায়?’তিনি বললেন, ‘তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ (হাদিস) অনুসারে বিচার করব’। তিনি বললেন,‘যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও না পাও?’তিনি বললেন, ‘আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করব’। তিনি বললেন,‘সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা’আলার জন্য যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে এইরূপ যোগ্যতা দান করেছেন”। (তিরমীযী শরীফ: ৩নংখণ্ড, ৯নং পৃষ্ঠা)

উপরোল্লিখিত হাদিস দ্বারা একথা বুঝা গেল যে, যদি কোন হুকুম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলে পাওয়া না যায়, তাহলে সে বিষয়ে পরামর্শ করা ওয়াজিব নয়। তখন মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করা জায়েজ। এই ক্ষেত্রে যদি পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া ওয়াজিব হতো যেমনটি ১নং হাদিসে (ابتغوا السواد الأعظم) উল্লেখিত প্রশ্ন থেকে বুঝা যায়, তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই মুআয (রাঃ)-কে এই আদেশ করতেন, যেন তিনি ইয়ামানে তার সঙ্গে থাকা সাথিদের (আবু মুসা আশআরী রাঃ, আলা বিন হাযরামী এবং আলী ইবনে আবী তালেব রাঃ প্রমুখ সাহাবীর) সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি বলেননি। সুতরাং কোন আলেম যখন কোন বিষয়ে কুরআন হাদিসের নস না পাবে তখন তিনি ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবেন, যদিও অন্যান্য আলেম এবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

روى العسكرى عن سليم بن العامرى، قال: سأل ابن الكواء عليا عن السنة والبدعة، وعن الجماعة والفرقة، فقال: يا ابن الكواء! حفظت المسئلة فافهم الجواب: السنة والله سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما فارقها، والجماعة والله مجامعة أهل الحق، وإن قلوا، والفرقة مجامعة أهل الباطل، وإن كثروا.–(العسكري)– قال الذهبي في الميزان عبد)،١٠٩ص ،١كذا في منتخب العمال ج ه وفي لسان الميزان أنه قد١ .الله بن الكواء من رؤوس الخوارج رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبته علي وباقى رواته لم اعرف وعلى تراجمهم لم أقف وإنما ذكرت الحديث متابعة)

“সুলাইম ইবনে আমিরী রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনুল কাওয়া রহঃ আলী রাঃ কে সুন্নত ও বিদআত এবং তাফরীক ওজামায়াতের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল;জবাবে আলী রাঃ বলেন,‘হে ইবনুল কাওয়া! এই মাসআলা ভালোভাবে বুঝে মুখস্থ করে রাখবে’। তারপর তিনি বলেন,‘সুন্নত হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল মোবারক,

আর বিদআত হচ্ছে যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল নয়। খোদার কসম! জামায়াত হচ্ছে হক্কের অনুসারীগণ, যদিও তারা সংখ্যায় কম হোন, আর তাফরীক হচ্ছে বাতিলপন্থীদের অনুসরণ করা, যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হোক"।

وقال الحافظ في الفتح تحت حديث ابن عباس في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة ابي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات الخ ما نصه، فيؤخذ منه أن الأقل عددا في الإجتهاد قد يصيب ويخطئكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثر، ولا سيما إن ظهر أن بعضهم قلد بعضا– ج

উল্লেখিত হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, হক্কপন্থীদের সাথে থাকার অর্থই হচ্ছে জামায়াতের সাথে থাকা, যদিও তারা সংখ্যায় কম হয়। পক্ষান্তরে যে বাতিলদের সাথে থাকবে সে জামায়াত থেকে আলাদা, সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন;তাদের সাথে থাকাকেই বিচ্ছিন্নতা বলা হবে। সুতরাং কোন মাসআলার ক্ষেত্রে যার মত ফিকহী দলিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং ফুকাহায়ে কেরামের মতের অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেই সত্যের উপর থাকবে, যদিও সে একা থাকে। তবে যারা দলিল বুঝতে সক্ষম নয়, তারা এ ক্ষেত্রে তাকওয়া, ইলম, দ্বীনের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা, খোদাভীতি, ধার্মিকতা ও বুদ্ধির বিচারে যে আলেম অন্যদের থেকে উৎকৃষ্ট হবে সেই আলেমের অনুসরণ করবে, কেননা এমন ব্যক্তি সুন্নাতে নববীর বিষয়ে অধিক অনুসরণীয় হয়ে থাকে।

وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَلَى فَقِيهًا لَهُ رَأْيٌ فَاسْتَفْتَى فَقِيهًا آخَرَ فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ رَأْيِهِ يَعْمَلُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَلَى جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِفَتْوَى أَفْضَلِ الرِّجَالِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ (كتاب أدب القاضي، الباب الثامن عشر في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه وفيه بعض مسائل الفتوى)

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

১.যদি কোন ব্যক্তি নিজেই ফকীহ হয়, তাহলে সমকালীন মাসআলার ক্ষেত্রে নিজ মত অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। অন্যান্য ফকীহদের মত যদিও তার মতের বিপরীত হয়, এতদস্বত্বেও তার জন্য অন্যান্য ফকীহদের মত অনুযায়ী আমল করা জায়েজ নেই।

২.সাধারণ লোকেরা নতুন মাসআলার ক্ষেত্রে ঐ আলেমের ফতওয়া অনুযায়ী আমল করবে, যিনি তার নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হবে। এখানে একথা বলা হয়নি যে, যেদিকে লোকসংখ্যা বেশি হবে সেদিকে যেতে হবে;বরং স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেই আলেম তার নিকট সবচেয়ে উত্তম তার ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া:৩য়খণ্ড, ৩৫৫নং পৃষ্ঠা)

وفي المنار ونور الأنوار في تعريف الإجماع هو إتفاق مجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر واحد أمر قولي أو فعلي وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر، ১هـ
রিসালাতুল মানার এবং নূরুল আনওয়ারে ইজমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,"কোন একটি বিষয়ে একই যুগের সকল মুজতাহিদের ঐক্যমতকে ইজমা বলা হয়। সেক্ষেত্রে একজনেরও যদি মতভিন্নতা থাকে, তাহলে সেটাকে আর উম্মতের ইজমা বলা যাবে না।

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون واحترز بلفظ المجتهدين بلام الإستغراق عن أتفاق بعضهم وعن أتفاق غيرهم من العوام والمقلدين فان৩ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأها، ج
কাশশাফ গ্রন্থের 'إصطلاحات الفنون'এ রয়েছে; ইজমার সংজ্ঞার মাঝে من المجتهدশব্দের الإستغراق لامএর মাধ্যমে "আওয়াম" এবং মুকাল্লিদিনদের কোন বিষয়ে একমত হওয়া কিংবা মতানৈক্যকে নাকচ করা হয়েছে। কেননা তাদের ঐক্যমত এবং মতানৈক্য বিবেচনার বাহিরে।

সুতরাং বুঝা গেল, জমহুর উলামায়ে কেরামের সাথে কোন একজন আলেমের মতভিন্নতার ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনাই রয়েছে। ভিন্নমত পোষণকারী আলেমের মতটিসঠিক অথবা জমহুরের মতটি সঠিক। আর যদি জমহুরের বিপরীত বক্তব্য সর্বদা অগ্রহণযোগ্যই হয়, তাহলে তো একক ব্যক্তির মতানৈক্য কখনোই ইজমার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতো না;বরং তাকে জমহুরের মতামত মানার জন্য বাধ্য করা হতো;অথচ এটা কোন মাজহাবে জায়েজ নেই। সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জমহুরের বিপরীত কোন একক ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক হতে পারে। আবার এ বিষয়টাও স্পষ্ট হলো যে, বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম যদি শরীয়তের কোন মাসআলার ব্যাপারে ঐক্যমত

প্রকাশ করেন, তারপরেও আমি বলব এটা কোন শরয়ী ইজমা নয়। কেননা মুকাল্লিদিনদের ইজমার কোন ধর্তব্য নেই। সুতরাং তিন-চারশত উলামায়ে কেরামের কোন বিষয়ে একমত হওয়াকে কোন ভাবেই ইজমা বলা ঠিক হবে না, যেখানে তাদের বিপরীত মতের একটি জামায়াতের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে;যদিও তাদের ধারণা অনুযায়ী এরা খুব কম সংখ্যক হয়।

فإن قلت: قال البيرى تحت قاعدة الأصل الحقيقة ما نصه متى أختلف في المسئلة فالعبرة بما قوله الأكثر– فتاوى حامدية، قلت هذا متعلق بباب النقل دون الفهم والاستنباط، والعمل.8ج بقول الأكثر في باب النقل متعين فان الخبر المشهور مقدم على الآحاد، والمتواتر مقدم على كليهما،

যদি তুমি বল যে, বীরী রহঃ একটি মৌলিক কায়দার আলোকে বলেন,"যখন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিবে, তখন অধিকাংশের মতই ধর্তব্য হবে"। (ফাতাওয়া হামিদিয়্যা:৪র্থখণ্ড)

আমি বলব,'এটা বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত, বুঝা বা উদঘাটনের সাথে এটি সম্পর্কিত নয়'। বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতের উপর আমল করার বিষয়টি নির্ধারিত। কেননা 'খবরে মাশহুর' 'খবরে ওয়াহেদ'এর উপর প্রাধান্য পায়। আর 'খবরে মুতাওয়াতের' উভয়টার উপর প্রাধান্য পায়। উপরের আলোচনা ছিল শাখাগত মাসআলা তথা فروعيবিষয় নিয়ে। পক্ষান্তরে, ইতিকাদী বিষয়ে ইখতেলাফ হলে অধিকাংশের মত অনুসরণ করাই ওয়াজিব। কেননা ইতিকাদী বিষয়গুলোর সম্পর্ক হলো খাইরুল কুরুনের সাথে। যেখানে হক্ব ও কল্যাণেরই প্রাধান্য ছিল। আর এ কথা স্বীকৃত যে, ইতিকাদী বিষয়ের মূল ভিত্তি হলো (رواية) রেওয়ায়েত, তথা বর্ণনাসূত্র এবং শ্রবণের উপর, (دراية)দিরায়াত, তথা ফিকহ ও ইজতিহাদ নয়। ইতিকাদী বিষয়ে যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িদের জামানায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে তাঁদের বিপরীত যে কোন বক্তব্যই প্রত্যাখ্যাত, এক্ষেত্রে বিপরীত বক্তব্যের প্রবক্তা যে পরিমাণই হোক না কেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ) : يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ، وَالْمُرَادُ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ: وَهَذَا فِي أُصُولِ الِاعْتِقَادِ كَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْفُرُوعُ كَبُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ مَثَلًا فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى الْإِجْمَاعِ، بَلْ يَجُوزُ اتِّبَاعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ،

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস,"তোমরা সাওয়াদে আযমের অনুস্মরণ কর" এর ব্যাখ্যায় মেরকাতের মুসান্নিফ মোল্লা আলী কারী রহঃ বলেন,'ইতেকাদী বিষয়ে বড় জামায়াতের অনুস্মরণ ওয়াজিব, এর বিপরীতে কোন মুজতাহিদের একক মতামতের অনুসরণ জায়েজ হবে না। যেমন, দ্বীনের রুকন সংশ্লিষ্ট বিষয়। পক্ষান্তরে শাখাগত বিষয়ে জমহুরের খেলাফ কোন একজন মুজতাহিদের অনুসরণ জায়েজ আছে। যেমন, অজু ভঙ্গের কারণ সংশ্লিষ্ট মাসআলা'। (মেরকাতুল মাফাতীহ: ১মখণ্ড, ২৬১নং পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত ইবারত থেকে প্রথমত এই বিষয়টি স্পষ্ট এবং দৃঢ় হয় যে, ফুরুয়ী তথা শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে অধিকাংশের অনুসরণ জরুরী নয়;বরং কোন একজন মুজতাহিদেরঅনুসরণই যথেষ্টএবংহতে পারে তার বক্তব্য অধিকাংশের বিপরীত। দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার তা হচ্ছে, যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাঝে মতানৈক্য দেখা দিবে তখন এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, মুসলমানদের যদি কোন ইমাম থাকে তখন উক্ত ইমামের অনুসরণ এবং ঐ জামায়াতের সাথে থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়ে দূরে থাকা এবং তাদের মুখালাফাত করা জায়েজ নেই।

মোটকথা, সে যদি কোন বিষয়ে শরীয়তের বিপরীত করতে আদেশ করে ঐ অবস্থায় তার সাথে একমত পোষণ করা যাবে না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না'। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে যথাসাধ্য তার বিরোধিতা করা। তবে এ স্তরের বিরোধিতা করা যাবে না, যে বিরোধিতা লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে আসে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মাঝে শৃঙ্খলা ব্যহত হয়। হ্যাঁ, যদি ইমাম অথবা ইমামের আনুগত্যশীল দল থেকে কোন স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায়, তখন তার মোকাবেলা করা এবং তার দলকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়াও জায়েজ আছে;বরং যথাসাধ্য তাকে প্রতিহত করা ওয়াজিব।

পক্ষান্তরে, মুসলমানদের যদি কোন ইমামই না থাকে, তখন ফিকহ শাস্ত্রে যাদের ব্যুৎপত্তি রয়েছে অর্থাৎ ফকীহ, ইবাদতগুজার এবং নেককার মুসলমানদের পরামর্শে কোন একজনকে ইমাম নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন একক ব্যক্তির মতের উপর আমল করা জায়েজ নেই, বরং নেককার বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এবং অধিকাংশ মুসলমান যার ব্যাপারে একমত পোষণ করে তাকেই ইমাম বানানো আবশ্যক। কেননা ইমামতের দায়িত্ব সম্ভ্রান্ত, বিচক্ষণ, নেককার উলামায়ে কেরাম এবং জমহুর মুসলিমদের বাইয়াতের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে;দু-একজনের বাইয়াতে কেউ ইমাম হতে পারে না।

এ কারণেই এই ক্ষেত্রে "আহলুল হল্লি ওয়াল আকদ" তথা শুরার অধিকাংশের রায়ই ধর্তব্য হবে, কোন একক ব্যক্তির রায় ধর্তব্য হবে না। বরং কোন একক ব্যক্তির জন্য জামায়াতের বিরোধিতা জায়েজ নেই। তবে যদি উলামায়ে কেরাম ও সকল মুসলিমরা একজনের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করে এবং তার মতামত মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে উকিল হওয়ার সুবাধে ঐ একক ব্যক্তির রায়ই গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ কোন খলিফা যদি তার পরে অন্য কাউকে খেলাফতের দায়িত্বে নিযুক্ত করে যায়, তাহলে পূর্বের খলিফার ন্যায় তার আনুগত্য প্রকাশ করা সকলের জন্য আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত খলিফা অযোগ্য হতে পারবে না।

মোটকথা, পরামর্শ ইত্যাদি দ্বারা যদি কোন ব্যক্তির খেলাফতের বিষয়ে সকলের সম্মতি পাওয়া যায়, তাহলে পূর্বের খলিফার ন্যায় তাকেও মান্য করা ওয়াজিব। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কারো জন্য ইমাম এবং জামায়াতে মুসলিমার বিরুদ্ধে অবস্থান করা জায়েজ নেই;যেমনটি আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর যদি পরামর্শ করতে গিয়ে কারো খেলাফতের বিষয়ে একতা না পাওয়া যায় বরং মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তখন কোন জামায়াতের সঙ্গ না দিয়ে একাকী অবস্থানই শ্রেয়।

অনুবাদঃ মাওলানা সাইফুল ইসলাম ('নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের এপ্রিল-২০২০ সংখ্যার ৪৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

সম্মান কেবল

আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের জন্য

কাজী আবু আহমাদ

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

শক্তি-সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্যই। [সুরা মুনাফিকুন ৬৩:৮]

আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের জন্য রয়েছে সম্মান।

২০২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কারণে সর্বদা মনে থাকবে। এই দিন ঐ সকল অহংকারীদের মুখের উপর জোরদার চপেটাঘাত করা হয়েছে, যারা ২০০১ সালের ১৭ই অক্টোবর "Operation Enduring Freedom" এর নামে ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তানের উপর চড়ে বসেছিল। আজ যুগের সুপার পাওয়ার নিজে এবং আরো ৪৮ রাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার করার পর, নিজেদের অহংকার ও সম্মান ঝুলিতে বেঁধে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের পায়ের নিচে সমর্পণ করেছে। এখন তারা ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অথচ এই মুজাহিদ ও আফগান-বাসীদের শেষ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় তাদের সকল প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়েছিল।

চুক্তির বিবৃতিতে যে সমস্ত স্থানে ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তানের নাম এসেছে, সেখানেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "যাকে আমেরিকা সরকার হিসেবে সত্যায়ন করেনা এবং যাদেরকে তালেবান বলা হয়"। হুদাইবিয়ার সন্ধির বিবৃতি থেকে رسول الله (রাসূলুল্লাহ) শব্দ বাদ দেওয়ার দ্বারা যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান, মর্যাদা, বড়ত্ব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রাসূল হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আসে নাই; তেমনিভাবে আমেরিকা ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তানকে সরকার হিসাবে স্বীকার করেনা-এটি লিখার দ্বারা বাস্তবতার কোন পরিবর্তন হয়ে যাবেনা।

চুক্তি তার সাথেই করা হয়, যাকে কোননা কোনভাবে সত্যায়ন করা হয়। তালেবান হচ্ছে সেই দল যাদের দাবিই হলো, 'আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চলবে'। তারা শরিয়ত বাস্তবায়নের শ্লোগান দেয়। তাদের প্রবল ইচ্ছা হলো আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়ন করা। তালেবানদের দাড়ি, পাগড়ী, জামা, টাখনুর উপরের পায়জামা, হাতের তসবিহ এবং لا إله إلا الله কালিমা দ্বারা সজ্জিত সাদা পতাকা থাকাটাই প্রমাণ করে যে, এরাই হচ্ছে সেই তালেবান যাদের সাথে উক্ত গুণাবলিসহ-ই আমেরিকা চুক্তি করেছে। এই চুক্তি আফগানিস্তানের দখলদার গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। তাদেরকে-তো ঐ চুক্তি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণই জানানো হয়নি।

এই চুক্তি মোল্লা ওমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ এর বপনকৃত বিজ যা ঐ তালেবান আন্দোলনের সাথে হয়েছে, যাদেরকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এই আমেরিকান জোট ময়দানে নেমেছিল। ঐ ময়দান শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ও পলায়নের সাক্ষী হয়ে রইল।

কাফেররা যতই ইচ্ছা পোষণ করুক যে, ইসলামের উচ্চতার পাথরকে নিঃশেষ করে দিবে, তবে এমন হবেই না- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র শানে বেয়াদবি-কারী অভিশপ্ত সালমান তাছীরকে জাহান্নামে প্রেরণকারী মুমতাজ কাদেরীকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়। যাতে করে ঐ স্মরণীয় দিনকে ভুলিয়ে দেওয়া যায়। এখন ঐ মহান চুক্তির উপরেও ২৯ ফেব্রুয়ারিই স্বাক্ষর করা হয়, যাতে করে এই দিন মুসলমানদের অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কুফর সর্বদা এটা ভুলে যায় যে, তারা আল্লাহর নূরকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে পারবে না। আল্লাহর নূর সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য এসেছে, তাকে এই কুফর শেষ করতে পারবেনা। এটা সত্য যে, মুসলিমদের সম্মান সর্বদা তাদের ধর্মের কারণেই মিলে এবং মিলবে। বায়তুল মাকদিস বিজয়ের পর, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চাবি গ্রহণের জন্য শামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর সময় গোলাম উটের উপর আরোহণরত এবং আমিরুল মুমিনীন ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তালিযুক্ত পোশাক পড়ে উটের নাকে বাঁধা রশি হাতে নিয়ে খালি পায়ে সফর করছিলেন। সেখানে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে তাঁর পোশাক বদলানোর অনুরোধ জানান।

জবাবে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন,
"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের কারণে সম্মানিত করেছেন। যদি আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোথাও সম্মান খুঁজি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অপদস্থ করে দিবেন"।

দুনিয়া এমনও লোক দেখেছে, যারা নামে মুসলমান কিন্তু "সম্মান" এর অনুসন্ধানে কাফেরের দরবারে মাথা নত করে। কিন্তু তা থেকে তারা সর্বদা অপদস্থ হয়েই বের হয়েছে। তারা কিছু প্রশংসনীয় বাক্য এবং মুখের উপর কিছু ফুল নিক্ষেপের বিনিময়ে কাফেরের পক্ষ থেকে সমস্ত লাঞ্ছনা, অপমান ও অপদস্থতাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। দুনিয়া ঐ মহান তালেবানদেরকেও দেখেছে, যারা নিজের ধর্মের উপর গৌরব করে। যারা নিজের ধর্ম এবং তার থেকে প্রতিশ্রুতিকে নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান ও সফলতার মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা শুধু দাবির উপরেই ছেড়ে দেয়নি, বরং মহিমান্বিত প্রভুর গৌরবের জন্য চিৎকার করে উঠেছিল। এই রব তাদেরকে সকল দিক দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন এবং খুব ভালো করে পরীক্ষা নিয়েছেন। তবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে তালিবানরা সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখন আল্লাহ তা'আলাও নিজের ওয়াদা পূরণের জন্য তাদেরকে ঐসম্মান ও মর্যাদা দ্বারা পুরস্কৃত করলেন, যা বাদশার দরবারে সিজদা কারীদের কখনো স্বপ্নেও ভাগ্যে মিলবেনা। দুনিয়া নিজ চোখে শান্তি চুক্তির দস্তখতের সময় দেখেছে, কাফের প্রতিনিধিদের ও সমস্ত দুনিয়ার মিডিয়ার সামনে তাকবিরের শ্লোগান উঠল। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের আহবান সকল কান শুনেছে এবং সমস্ত মুসলমানের অন্তর প্রশান্ত হয়েছে।

শুধু এতেই শেষ নয়। ইতিহাসে এমনটা কখনো হয়নি যে, অহংকারী আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের কেউ –কোন গ্রুপের নেতাকে ফোন করে সরাসরি কথা বলে। তবে আফগানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ দেখিয়েছেন যে, নিজের সামরিক শক্তির উপর অহংকারকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তালেবানের পক্ষ থেকে কোন দরখাস্তের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং নিজ থেকে নিজের অহংকারকে দূরে সরিয়ে রেখে ইসলামিক ইমারত তালেবানের রাজনৈতিক বিষয়ের নায়েবে আমির ভাই মোল্লা আব্দুল গনী হাফিজাহুল্লাহকে ফোন করে তার সাথে কথা বলার মর্যাদা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প তার প্রশংসাও করেছে। যে মাথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয়না, আল্লাহ তার সামনে গর্ব এবং অহংকারে মোড়ানো গর্দান সমূহ ঝুঁকিয়ে দেন এবং আল্লাহ তা'আলাই কাফেরদের অন্তরে মুমিনদের ভয় প্রবেশ করিয়ে দেন। অন্য দিকে তালেবানের কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা দেখুন। যখনি কেউ এই বিজয়কে তালেবানদের বলে অভিহিত করেছে তখনি তারা নিজ সাথি ও অন্যদেরকে অহংকার না করে, ঐ বিজয়কে মানুষের দিকে না করে সরাসরি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার উপদেশ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বিজয় এবং সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এবং তিনি যা চান তাই করেন। শান্তি চুক্তির দিনটিতে সকলের জন্য, বিশেষ করে ইসলামিক দেশ গুলোর প্রধানদের জন্য অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে। স্থিতিশীল, আদর্শ ব্যবস্থাপনা, সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সকল ধরনের অস্ত্র এবং প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত এতো বড় বড় সশস্ত্রবাহিনীর দেশ গুলোর প্রধানদের চিন্তা করা উচিত যে, বছরের পর বছর স্থায়ী যুদ্ধ দ্বারা দুর্দশা গ্রস্ত আফগানিস্তানের গাজী আফগান জনগণের নিকট এমন কি রয়েছে যে, একের পর এক দুনিয়ার সুপার পাওয়ার তাদের সামনে পরাজয় মেনে নেয়? তাদের নিকট শুধুই ঈমান রয়েছে। ঐ ঈমান! যাকে অধিকাংশরা সামান্য ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করে অপমানিত হয়ে থাকে। ঐ ঈমান! যার মূল্য গ্রহণ না করে ইসলামিক ইমারতের তালেবানরা সফল হয়েছেন।

পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন ইসলামিক ইমারতের তালেবানকে সঠিক পথের উপর চলার তাওফিক দান করেন। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং আফগানিস্তান ও সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে শরিয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের সাহায্য করেন।

الله اكبر ولله الحمد

আল্লাহ সবচেয়ে বড় এবং আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।

অনুবাদঃ আবু খাদিজা ('নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ' ম্যাগাজিনের মার্চ-২০২০ সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

ইরান ও আমেরিকা

বন্ধু না শত্রু বাস্তবতা কী

মূল: আবু ওমর আবদুর রহমান
অনুবাদ: সাহাল বিন ওমর

তারবিয়াহ । ৩০

ইরান ও আমেরিকার মাঝে বর্তমান সংকটের কারণ কী?

তাদের পরস্পরের সম্পর্কটা কোন ধরণের?

ইসরাইলের সাথে ইরানের শত্রুতা কতটা শক্তিশালী?

ইরানের উপর আমরা মুসলমানরা কেমন আশা ভরসা করা উচিৎ?

পূর্ব মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে আরব শাসকরা কোন প্লাটফর্মে আছে?

আমেরিকার ব্যাপারে আমাদের নীতি কী?

আমরা আমাদের ঘর রক্ষা করতে হলে কার দিকে তাকাবো?

এই প্রবন্ধে এসমস্ত প্রশ্নগুলোর জবাব মিলবে ইনশা আল্লাহ।

ইরানের জেনারেল কাসেম সোলাইমানি, সাধারণ কোন জেনারেল ছিলেন না। বহির্বিশ্বে ইরানের সকল যুদ্ধ ও গোয়েন্দা তৎপরতা সোলাইমানির কমান্ডে ছিল। শাম (সিরিয়া), ইরাক, ইয়েমেন ও লেবানন এই চার দেশে শিয়া মিলিশিয়াদের তত্ত্বাবধান ও কন্ট্রোল, গত বেশ কয়েক বছর যাবত তার হাতেই ছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানে গত সেপ্টেম্বরে হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের তেলের ডিপোতে আক্রমণ করেছে। ৩রা জানুয়ারি ২০২০ ইং সোলাইমানি বাগদাদ এয়ারপোর্টে নিহত হয়েছেন। তাও আবার আমেরিকান ড্রোন হামলায়। এই খবর শোনার সাথে সাথেই নিজের অজান্তে আলহামদুলিল্লাহ বললাম এবং এই দু'আ পড়লাম,

اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين.

'হে আল্লাহ! জালেমের হাতেই জালেমকে ধ্বংস করুণ এবং তাদের মাঝ থেকে মুসলমানদেরকে নিরাপদে বের করে আনুন'। আমীন।

জি হাঁ, এটা আল্লাহ তা'আলার বিরাট বড় অনুগ্রহ যে, ইরানের সেই জেনারেল নিহত হয়েছে যে শাম (সিরিয়া), ইরাক এবং ইয়েমেনে মুসলিম জনসাধারণ ও মুজাহিদীনে ইসলামের গণহত্যার জিম্মাদার ছিল। আমেরিকা জালেম, ইরানও জালেম, তারা একে অপরকে অনেক গালমন্দ করে। কিন্তু উভয়ে মিলে আহলে সুন্নাহকে অধিনস্ত করা, সুন্নী জনসাধারণকে হত্যা করা এবং জিহাদী আন্দোলনকে খতম করার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত পরস্পর অনেক বড় সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।

যখন আমেরিকার আক্রমণের মুখে আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়ার পতন হলো, তখন ইরান পরিপূর্ণভাবে আমেরিকার সাথে ছিল। এরপর যখন আমেরিকা ইরাকে মুসলমানদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করল, তখন ইরান শুরু থেকে অর্থাৎ ২০০৩ ঈ. থেকে সোলাইমানির মৃত্যু (২০১৯ ঈ.) পর্যন্ত আমেরিকার প্রধান মিত্র হিসাবে সেখানে ছিল । ইরাকী সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে এবং শিয়া মিলিশিয়াদেরকে সহযোগিতা ও অস্ত্রে সজ্জিত করে, তাদেরকে আহলে সুন্নাহর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করানো এবং সুন্নী জনসাধারণের উপর তাদের কর্তৃক জুলুম নির্যাতনের মত সকল বিষয়ে, ইরানী সেনাবাহিনী এবং বিপ্লবী গার্ড সর্বদা নেতৃত্বে ছিল। আমেরিকার অন্য মিত্রদের চেয়ে ইরানের পক্ষে স্থানীয় শিয়াদের সমর্থনের কারণে, সব জায়গায় তারা অগ্রগামী এবং অসাধারণ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। আজ ইরানের পক্ষ থেকে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে যে, ইরাকে তাদের সহযোগিতা শুধু দায়েশের (আইএস) বিরুদ্ধে ছিল। মনে হয় যেন দায়েশ বাদে মুজাহিদীনে উম্মাহ ও আহলে সুন্নাহর উপর তারা আমেরিকার সাথে মিলে ফুল (!) বর্ষণ করেছে! তাদের দাবী কিছুতেই সত্য হতে পারে না।

প্রথমত: এই কারণে যে, আমেরিকা ও ইরানের পরস্পরে আপোষ ও সহযোগিতা, খারেজী বাগদাদীর আত্মপ্রকাশ থেকে শুরু হয়নি। এই সহযোগিতার সম্পর্ক ঐ সময় থেকে যখন আমেরিকা ২০০৩ ঈ. সনে ইরাক আক্রমণ করে। এই দীর্ঘ সময়ে আহলে সুন্নাহ জনসাধারণ এবং মুজাহিদীনের উপর আমেরিকা যত জুলুম নির্যাতন করেছে, ইরানী মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়ারাও তার সমপরিমাণ করেছে। ইরান ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এই দীর্ঘকাল লড়াইরত, আহলে সুন্নাহর সকল মহাবীরদের উপর ইরান "সন্ত্রাসী ও তাকফিরী" অপবাদ দিয়ে আসছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার পূর্ণ অংশীদার হিসাবে আছে।

দ্বিতীয়ত: দায়েশ (আইএস) যখন আত্মপ্রকাশ করেছে তখন কী আমেরিকা-ইরান মিত্রশক্তি শুধু দায়েশের বিরুদ্ধে অভিযানে সীমাবদ্ধ ছিল? না..., এমন কখনোই নয়। ইরান শুধু ইরাকে নয়, বরং শাম (সিরিয়া) থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত আহলে সুন্নাহর ঐ সকল মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গ দিয়েছে, যারা স্বয়ং দায়েশেরও টার্গেটে ছিলেন।

বাস্তবতা এই যে, ইরাক, শাম ও ইয়েমেনে ইরান তার যেই নীতিতে কাজ করতে পারছে তা একমাত্র আমেরিকার জোরে পারছে। ইরাক ও সিরিয়ায় আমেরিকান সৈন্যেরও এতো বড় সংখ্যা নেই যে পরিমাণ ইরানী সৈন্য এবং ইরানী মদদপুষ্ট শিয়া মিলিশিয়া আছে। আর তারা সবাই অবস্থান করছে আমেরিকান জেনারেলদের দৃষ্টি সীমায় এবং তাদের ড্রোন বিমানগুলোর ছায়াতে। মজার কথা হলো ইরাক, শাম ও ইয়েমেনে বর্তমানের এক-দুই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত, আমেরিকা কোন একজনও ইরানী অফিসার

বা সৈন্যকে টার্গেট বানায়নি।
সকল ইরানী সৈন্য এবং শিয়া মিলিশিয়া আমেরিকানদের সাথে পূর্ণ আপোষের সঙ্গে মুজাহিদদের উপর হামলা করে আসছে।

ইয়েমেনে ইরানী ইশারায় চলা হুথি বিদ্রোহীরা, মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাপোর্ট করে। কেমন যেন সেখানে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াইরত দুশমন তিনজন; ইরানী মদদপুষ্ট হুথি, আমেরিকা ও সৌদি মিত্রজোট। সৌদি মিত্রজোট এবং হুথিদের মাঝে বর্তমানে যুদ্ধ চলছে। কিন্তু যে জায়গায় মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় সেখানে ইরানী মদদপুষ্ট হুথিরাও আমেরিকার মিত্র হয়ে যায়। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, ইয়েমেনে আনসারুশ শারইয়্যাহর (ইয়েমেন আল কায়দা) মুজাহিদীনের উপর হামলার জন্য আমেরিকা এসেছে, তখন তাদের ব্ল্যাক হক ও চিনুক হেলিকপ্টারগুলো ইরানী মদদপুষ্ট হুথিদের এলাকায় নেমেছে; অতঃপর সেখান থেকে আমেরিকানরা হুথিদের সহায়তায় মুজাহিদীনের উপর আক্রমণ করেছে।

আরো আকর্ষণীয় বিষয় হলো, সৌদি মিত্রজোটে অন্তর্ভুক্ত আরব শাসকরা সবাই আমেরিকার গোলাম, সৌদির প্রতিরক্ষাও পরিপূর্ণভাবে আমেরিকার হাতে ন্যস্ত। এরপরও এখানে সৌদি মিত্রজোট এবং হুথিদের মাঝে চলমান প্রচণ্ড যুদ্ধে আজ পর্যন্ত আমেরিকানরা, একজনও হুথি বিদ্রোহীকে হত্যা করেনি। আমেরিকান ড্রোন ও অন্যান্য বিমানগুলো আকাশে উড়তে থাকে, তারা হুথি এবং সৌদিদের মাঝে চলমান যুদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, কিন্তু সৌদিদের সাহায্যে আমেরিকানরা কখনোই ইরানী মদদপুষ্ট হুথিদের উপর বোমা বর্ষণ করেনি। আমেরিকা যদি কখনো কোথাও বোমা বর্ষণ করে তা একমাত্র আনসারুশ শারইয়্যার মুজাহিদীন এবং সুন্নী জনসাধারণের উপর এবং এ ক্ষেত্রে হুথিরা আমেরিকাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করছে।

অনুরূপ শামে (সিরিয়া) আহলে সুন্নাহর সাথে ইরানের যে পরিমাণ জুলুম, হিংস্রতা ও দাম্ভিকতা চলছে তার কোন উদাহরণ পৃথিবীতে নেই। এখানে ইরান বাহ্যিকভাবে সিরিয়া সরকার ও রাশিয়ার মিত্র। কিন্তু আসল সত্য হলো, মুজাহিদীন ও সুন্নী জনসাধারণকে গণহত্যার ক্ষেত্রে ইরান, আমেরিকা, রাশিয়া ও সিরিয়া সরকার সবাই একে অপরের সাথে সহযোগিতা ও আপোষের সাথে চলছে এবং প্রত্যেকেই নিজের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এক দিকে ইরানী মিলিশিয়া ও সিরিয়ান সৈন্যদের জোট; তারা সবাই একত্রে এক জায়গায় মুসলমানদের উপর হামলা করে তো অপরদিকে আমেরিকা ধ্বংসের তামাশা দেখে। ব্যারেল বোমা থেকে শুরু করে রাসায়নিক অস্ত্রসহ এমন কোন অস্ত্র বাকি নেই, যা এই জালেমরা ব্যবহার করেনি। সব ধরনের অস্ত্র তারা এখানে ইচ্ছেমত পরীক্ষা করেছে। এরপর অন্য কোন জায়গায় আমেরিকা বোমা বর্ষণ করে আর বাকীরা তামাশা দেখতে থাকে। এখানেও এই পুরা যুদ্ধে কখনো আমেরিকা ও ইরান পরস্পরে মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের পরিস্থিতি হয়নি।

তাদের দৃশ্যপট যখন এমনই তখন আমেরিকা কাসেম সোলাইমানিকে কেন হত্যা করল?

এটা হলো আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ; আল্লাহ তা'আলা এক জালেমের মাধ্যমে আরেক জালেমকে হত্যা করেছেন। অতীতেও যখন আহলে সুন্নাহর মুজাহিদীন এবং আমেরিকার সাথে যুদ্ধ হয়েছে তখন ইরান এ থেকে ফায়দা লুটেছে। সেই যুদ্ধকে সে খালেস বস্তুপূজা, আত্মপূজা ও আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখত। এমনকি আহলে সুন্নাহর উপর প্রভাব অর্জনের বিরল সুযোগ হিসাবে সেটাকে মনে করত এবং তা খুব ভালভাবে কাজে লাগাত।

আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন ও শাম সব জায়গায় সে এমনই করেছে। আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ কাল পর দৃশ্যপট কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং খোরাসান থেকে শাম ও ইয়েমেন পর্যন্ত যত মুজাহিদ ইরানের বাস্তব কর্মকৌশলের ব্যাপারে অবগত, তারা আজ অনেক খুশী। সবাই আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছেন এবং এই আশা করছেন যে, হয়তবা এই কারণে তাদের দুজনের মাঝে আজ পর্যন্ত চলে আসা আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে মিত্রতা, আজ খতম হবে এবং বিইজনিল্লাহ তাদের মাঝে যুদ্ধ হলে অথবা অন্তত অসন্তোষ বাড়লে, সেটা মুজাহিদীনে উম্মতকে দুশমনদের বিরুদ্ধে সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দিবে।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এই লেখার উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদেরকে আমাদের সকল দুশমনদেরকে ভালভাবে চিনতে হবে এবং তাদের সাথে আচরণের নিয়মনীতি কখনোই যেন আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের কল্যাণকামী ও অকল্যাণকামীদের না চিনব এবং তাদের সাথে তাদের উপযোগী আচরণ না করব, ততক্ষণ আমরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করতে থাকব এবং ইসলামের বিজয় ও মুসলমানের সাহায্যে কদম বাড়াতে পারব না।

বড় আফসোস হলো, উম্মতে মুসলিমার এক শ্রেণী এমন আছেন যারা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, কে বীরপুরুষ বা হিরো? কে জালেম? কে দুশমন? - এই বিষয়গুলো অনেক হালকা ভাবে নিচ্ছেন। তাই কখনো গাদ্দাফীকে বড় মুজাহিদ বলা হয়েছে! আবার কখনো সাদ্দাম হোসাইন তাদের হিরো হয়েছে! আবার কখনো লেবানন হিজবুল্লাহর সবচে বড় অপরাধী হাসান নসরুল্লার বিভিন্ন প্রশংসা করা হচ্ছে! কেন এমন হয়েছে??

এটা এজন্যই যে, গাদ্দাফী, সাদ্দাম বা হাসান নসরুল্লাহ তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলেছে। আবার কখনো আমেরিকা ও তাদের মাঝে অসন্তুষ্টি প্রায় যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর আমাদের ধারণা হলো, যেই নেতা আমেরিকার বিরোধিতা করতে পারবে সে-ই উম্মাহর নেতা, সে আমাদের হিরো এবং আইডল। তখন আমাদের বাকী উম্মতকেও তার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণীয় হিসাবে দেখানো হচ্ছে। এখানে এই বিষয়টি কখনোই উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করা হচ্ছে না যে, আমেরিকার এই বিরোধীতাকারীরা নিজ চিন্তা-চেতনা ও আমল-আখলাকে কতটা হকের উপর আছে? এবং সে নিজে উম্মাহর কতটা হিতাকাঙ্ক্ষী?

আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইকারী যদি নিজেই মুসলমানদের হত্যাকারী; উম্মতকে গোমরাহ করনেওয়ালা এবং জিহাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য সহযোগিতাকারী হয়, তাহলে এমন পর্যায়ে তার মাঝে এবং আমেরিকার মাঝে যুদ্ধে আমরা খুশী হবো এবং ঐ যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের কঠোরতার প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকবে ঠিক কিন্তু সেই ব্যক্তি কখনোই আমাদের আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারবে না এবং তাকে কখনোই উম্মাহর পথ প্রদর্শক ও হিতাকাঙ্ক্ষী বলব না এবং তাকে তার মেহনত ও চিন্তা চেতনায় তাকে অনুসরণীয় মনে করা হবে না।

এটা স্পষ্ট কথা যে, যুদ্ধ শুধুমাত্র হক ও বাতিলের মাঝেই হয় না। স্বয়ং বাতিলদের মাঝেও অনেক যুদ্ধ হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরে রাশিয়া ও আমেরিকার দ্বন্দ্ব, এরূপ আরও অগণিত উদাহরণ আছে, যার মধ্যে কোন পক্ষই আহলে হক ছিল না। ইরানের বিষয়টিও এমনই। ইরান খোদ বাতিল , তার ধর্মও বাতিল। তারা আহলে সুন্নাহর অত্যন্ত নিকৃষ্ট দুশমন। যখনই তাদের সুযোগ হয়েছে তারা আহলে সুন্নাহকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য জঘন্যতম অত্যাচার চালিয়েছে। উম্মাহর প্রতিরক্ষার জন্য যতো জিহাদী আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার অনেকগুলোর পেটে ইরান খঞ্জর চালিয়েছে এবং অধিকাংশের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য সহযোগিতা করতে সরাসরি ময়দানে নেমেছে। এরই সাথে ইরানের আরেকটি বিরাট বড় অপরাধ হলো, বড়ত্ব অর্জনের জন্য শিয়া মতবাদের মত শিরকী ও বিদআতি মিশন, উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তারা নিয়েছে এবং সারা দুনিয়ায় এর বিস্তৃতিতে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

তাই মূল আপত্তি হলো, ইরানের মত আঁচলে পালিত সাপকে মহব্বত করা, তার উপর ভরসা করা এবং নিজেদের দাওয়াতি আন্দোলনে তাকে অনুসরণীয় মনে করার উপর। বাকী আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থান এবং যুদ্ধ হওয়ার যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোতো খুশিরই বিষয়। আমরা এটাই দু'আ করি, যেন উম্মতে মুসলিমার উপর জুলুম নির্যাতন চালায় আমাদের এমন সব দুশমন পরস্পরে লড়াই করুক। তারা যখন পরস্পরে লড়বে তখন এ থেকে ফায়দা হবে জিহাদ, মুজাহিদীন এবং পুরা উম্মাহর। যেমন, আমরা খবর পেয়েছি যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইরানের পক্ষে থাকার মতামত ব্যক্ত করেছেন। যদি এমন হয়, তাহলে এটি হবে আরেকটি খুশি ও শুকরিয়ার বিষয়।

এখানে এটা স্পষ্ট যে, এমন অবস্থায়ও রাশিয়াকে আমরা আমাদের উপর অনুগ্রহকারী মনে করব না। সে দুশমন তাই দুশমন হিসাবেই থাকবে।

শিয়া ইরান আহলে সুন্নাহর দুশমন, সে কিছুতেই জিহাদী আন্দোলনগুলোর হিতাকাঙ্ক্ষী নয়; তারপরও ইরান ও আমেরিকার মাঝে বৈরিতা এবং যুদ্ধ কেন হবে? কেন তারা "আমেরিকার মৃত্যু হোক" এই স্লোগান দিচ্ছে? ইরান কেন ফিলিস্তিনে ইহুদী দখলদারিত্ব বিরোধী? কেন তারা ইসরাইলকে বিভিন্ন ধমকি দিচ্ছে? এই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জবাবের মাধ্যমে ইরানের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে যাবে।

কারো কারো খেয়াল ছিল, সম্ভবত এখনো আছে যে, ইরান ও আমেরিকা পরস্পরের মাঝে ভিতরে ভিতরে মিল রয়েছে, ইরান হলো মূলত ইহুদীদের এজেন্ট। আর এই পুরা খেলাটা একটা ড্রামার মত। আবার কিছু লোক ইরানকে হিরো মনে করে। তাদের ধারণা হলো, ইরান আমেরিকা ও ইসরাইলের দুশমন হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদেরও মুহাফেজ। বাস্তবতার নিরিখে এই দুটি অবস্থান পুরাই গলদ। আলহামদুলিল্লাহ যারা জিহাদের নেতৃত্ব দেন, তাদের কাছে ইরানের অবস্থান ও মর্যাদা সবসময়ই স্পষ্ট এবং তারা ইরানের ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্যও কখনো কোন গলদ ধারনায় আক্রান্ত হননি।

আমার এ মুহূর্তে জিহাদের একজন নেতার কথা মনে পড়ছে, কয়েক বছর আগে যখন আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "শাইখ! ইরান কি ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করতে চাচ্ছে? তখন তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, 'হাঁ..., তারা ফিলিস্তিনকেও স্বাধীন করতে চাচ্ছে! এবং মক্কা-মদিনাকেও। তারা চাচ্ছে সব আহলে সুন্নাহকে তাদের গোলাম বানাতে, তাদের উপর শিয়া মতবাদ চাপিয়ে দিতে। তাই তাদেরকে যত বড় কাফেরই সাহায্য করুক না কেন ইরানের জন্য এটি কোন বিষয়ই নয়'। বর্তমান যুগে ইরান শিয়াদের সর্দার এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদের পরিচালক ও অনুসরণীয়। এজন্য জরুরী হলো, শিয়াদের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের জেনে রাখা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'অধিকাংশ শিয়ার অন্তর উম্মাহর দুশমনদের সাথে যুক্ত। উম্মাহর মুহাফেজ মুজাহিদীনে আহলে সুন্নাহর পরাজয় এবং সুন্নী জনসাধারণের কষ্টে তারা খুশী হয়'।

আরেক জায়গায় শাইখ রহ. বলেন, 'শিয়ারা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য কাফেরদের সাহায্য সহযোগিতা নেয়। সবাই এ বিষয়টি দেখে থাকবে যে, যখনই মুসলমানদের উপর কাফেরদের হামলার মাধ্যমে কোন পরীক্ষা এসেছে, তখনই শিয়ারা সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গ দিয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে চেঙ্গিস খানকে তারা সাহায্য করেছিল, এরপর চেঙ্গিসের ছেলে হালাকু খান যখন হামলা করেছে তখন খোরাসান, ইরাক ও শামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় বড় সাহায্যকারীদের মধ্যে তারা ছিল। তাদের এই সাহায্য সহযোগিতা এতটা স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ যে, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

এ সময় বাগদাদে খলীফার উজির ইবনে আলকমী ছিল রাফেজী। সে সর্বদা মুসলমান এবং খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লেগে থাকত। মুসলিম সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা এবং তাদের রশদ সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করত এবং জনসাধারণকে মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে থেকে লড়তে নিষেধ করত। অতঃপর যখন তাতারীরা বাগদাদে প্রবেশ করে, তখন তারা মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা করে, লাখ লাখ মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করে, অগণিত বনু আব্বাস ও বনু হাশেম নিহত হয় এবং তাদের নারীদেরকেও তাতারীরা বান্দি বানিয়ে নেয়'। শিয়ারা আহলে বাইতকে মহব্বতের কথা বলে মুখে ফেনা উঠায়। তাহলে এটাই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতের মহব্বত! যে, তাদের উপর এবং অন্যান্য মুসলমানদের উপর কাফেরদেরকে বিজয়ী করতে হবে!? এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের নারীদেরকে বান্দি বানানোর জন্য কাফেরদেরকে সাহায্য করতে হবে!!?

অনুরূপ শামে বসবাসরত তৎকালীন শিয়ারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও খৃস্টানদেরকে সাহায্য করেছে।

এখানেও কুফফাররা শিয়াদের সহযোগিতায় মুসলমানদের জান-মালের অনেক ক্ষতি করেছে এবং তাদের নারীদেরকে বান্দি বানিয়েছে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ শহীদ রহ. ইরানের একদিকে আমেরিকাকে শত্রু ঘোষণা করা এবং অপরদিকে আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য সহযোগিতা করার কারণ বর্ণনা করে লিখেছেন,

'আমেরিকার সাথে ইরানীদের সহযোগিতা ও মিত্রতার কারণ হলো, শিয়া মতবাদের মূলনীতি। এটা এমন মূলনীতি, যাকে তারা মিথ্যা ও তাকিয়্যার (ইচ্ছাকৃত মিথ্যাকে সওয়াব মনে করা) দ্বারা যতই ঢাকার চেষ্টা করুক; কার্যক্ষেত্রে কখনোই তারা এই মূলনীতি থেকে হটতে পারে না। আসল সত্য হলো, তাদের পুরা ইতিহাস ও অস্তিত্বে এই মূলনীতির উপর আমল অত্যন্ত স্পষ্ট। মূলনীতিটি এই, তাদের নিকট তাদের সবচে বড় ও প্রধান দুশমন হলো আহলে সুন্নাহ। ইহুদী, খৃস্টানরাও শত্রু তবে যেহেতু তারা আহলে কিতাব, এজন্য আহলে সুন্নাহর চেয়ে তাদের সাথে দুশমনি কিছুটা হালকা। সুতরাং ইহুদী, খৃস্টানদের সাথে কোন না কোনভাবে চলাফেরা করা যায় কিন্তু আহলে সুন্নাহর সাথে কোন ভাবেই নয়' ।

একদিকে শিয়াদের ইরানে আকিদা ও কাজকর্ম এমন, অপরদিকে তার অশেষ চেষ্টা হলো, উম্মতে মুসলিমার একক নেতা হিসাবে নিজেকে দেখানো। এজন্য তারা আহত উম্মাহ তথা ফিলিস্তিনসহ অন্যান্যদের পক্ষ নিয়ে রাজনীতি করে এবং তাদেরকে শিয়া মতবাদ বিস্তার ও বিজয়ী করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। তাহলে বুঝা গেল, তাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো, আহলে সুন্নাহকে কাবুতে আনা, তাদেরকে নিজেদের গোলাম বানানো এবং একই সাথে নিজে নিজেকে পুরা মুসলিম উম্মাহর একক পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক প্রমাণিত করা, অতঃপর তাদের উপর শিয়া মতবাদকে শক্তিশালী করা।

তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, এরচেয়ে সামনে বেড়ে পুরা দুনিয়ায় নিজেদের রাজত্ব কায়েম করা। এতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহলে সুন্নাহর পরে ইসরাইলের সাথে তাদের বিবাদ হবেই। তারা নিজেদের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপন কার্যক্রমে খুব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে। তারা জানে, তাদের এই অভিসন্ধির প্রথম স্তর তখনই হাসিল হবে যখন আহলে সুন্নাহর জনসাধারণ ইরানের উপর ভরসা করবে এবং তাকে নিজেদের লিডার মনে করবে। আর এই বিশ্বাস ও ভরসা অর্জন শুধু ঐ সময়ই সম্ভব যখন উম্মতে মুসলিমার বুনিয়াদী এবং সবচেয়ে বড় সমস্যার ব্যাপারে ইরান উঁচু আওয়াজে কথা বলবে। মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সমস্যার একটি, মসজিদে আকসার সমস্যা। ফিলিস্তিন হলো উম্মাহর পুরনো জখম। যদি কেউ উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব চায়, উম্মাহর উপর নিজ আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করতে চায়, অথচ সে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে চুপ থাকে, তাহলে উম্মত কখনোই তার উপর ভরসা করবে না। এই কারণেই ইরান ফিলিস্তিন বিষয়ে ইসরাইলের বিরোধিতা করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাদের এ যুদ্ধ বেশির ভাগ মুখে মুখেই, তবে কাজেকর্মেও সামান্য কিছু হয় যা অস্বীকার করার মত নয়। "হিজবুল্লাহ" এর ইতিহাস দেখলে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

"হিজবুল্লাহ" লেবাননে সামরিক ও রাজনৈতিক একটি শিয়া গ্রুপ। তারা মূলত ইরানের আন্ডারে চলে এবং তারা ইরানের পররাষ্ট্রনীতির এক বাস্তব রূপ। এই গ্রুপের ভিত্তি ১৯৮২ ঈ. সনে দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসনের সময়। গ্রুপটি প্রথম দিন থেকেই নিজেদের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে, দখলদার ইসরাইলকে খতম করা। বাস্তবেও এটা তাদের উদ্দেশ্য, তবে এর মানে কি ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বের ইহুদীদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন তাদের উদ্দেশ্য? এবং তারা কি বিশেষত এই উদ্দেশ্যেই লড়াই করছে?

না...। বরং এটা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আখেরি পর্যায়ে থাকলে থাকতে পারে কিন্তু তাদের প্রথম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, লেবানন থেকে ইসরাইলকে বের করা, এখানে নিজেদের শিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সমস্ত আহলে সুন্নাহকে করায়ত্ত করতে এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করা। এই কারণেই ইসরাইলের সাথে তাদের সব বিবাদের প্রথম দিন থেকেই তাদের উদ্দেশ্য হলো, ইসরাইল থেকে লেবাননের ভূমি উদ্ধার করা; ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা নয়।

১৯৯৩ ঈ. সনে যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ হয় তখন ইসরাইল লেবানন ছেড়ে চলে যাওয়ার অভিমত পেশ করলে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ইসরাইল-লেবানন সীমান্তে পূর্ণ শান্তির অঙ্গীকার করা হয় এবং তারা লেবাননের পার্লামেন্ট রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০০ ঈ. সন পর্যন্ত ইসরাইল লেবাননের সীমানার বাইরে থাকে, তবে লেবাননের দাবীকৃত "মাযারে শাবআ" নামক এলাকার উপর নিজের দখল বাকী রাখে। একারণে ২০০৬ ঈ. সনে আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ বন্ধ হয় জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। হিজবুল্লাহ সিদ্ধান্তটি মেনে নেয়। তার মধ্যে বলা ছিল যে, ইসরাইল লেবাননের ভূমি ছেড়ে দিবে, আর হিজবুল্লাহ ইসরাইলের বিরুদ্ধে সব ধরনের কর্মসূচী বন্ধ করবে এবং হাতিয়ারও ছেড়ে দিবে।

হিজবুল্লাহ হাতিয়ার ছাড়েনি, কিন্তু এর পর থেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঐরকম কর্মসূচী অবশ্যই বন্ধ করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে হাসান নসরুল্লাহ এক ভিডিওতে নিজের অবস্থান দেখিয়ে নিয়েছে যে, 'ইসরাইল যদি লেবাননের ভূমিতে আগ্রাসন না চালায় তাহলে আমরাও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচী নিবো না। তবে রাজনৈতিকভাবে আমাদের এই দাবী বাকী থাকবে যে, ফিলিস্তিনের উপর ইহুদীদের দখলদারিত্ব অবৈধ।' অর্থাৎ ফিলিস্তিনের আযাদির জন্য আমাদের থেকে মুখে মুখে কিছু জমা খরচ হবে, বাকী যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ শুধু লেবাননের ভূমি রক্ষার জন্য হবে; যে ভূমিতে হিজবুল্লাহ নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবে, যে ভূমিকে আরব বিশ্বে শিয়া ইরানের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হবে। কিছুকাল যাবত লেবাননের সীমান্ত এলাকায় হিজবুল্লাহ'র পূর্ণ ক্ষমতা চলছে। যদি কোন জিহাদী গ্রুপ বা কোন মুজাহিদ ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে, তাহলে খোদ হিজবুল্লাহ তাকে গ্রেফতার করে লেবানন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা সিরিয়ান সেনাবাহিনীর কাছে সোপর্দ করে দেয়। আবার অনেক মুজাহিদকে হিজবুল্লাহ নিজ আগ্রহে গ্রেফতার করিয়েছে।

তাছাড়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তো লেবাননের ভূমিতে ইসরাইলি হামলার শর্ত করা হয়েছে, কিন্তু আহলে সুন্নাহ ও মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লেবাননের এমন কোন শর্ত নেই। আহলে সুন্নাহ যদি লেবাননের উপর হামলা নাও করে, হিজবুল্লাহ'র বিরুদ্ধেও যদি না লড়ে, বরং শুধু সিরিয়ার তাগুত বাশার আল আসাদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়; তবুও হিজবুল্লাহ মনে করে যে, তাদের আন্দোলনকে প্রতিহত করা এবং তাদের জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালানো, এটা তার যিম্মাদারি। এমনকি এই যিম্মাদারি পালনের জন্য সে লেবানন থেকে সিরিয়ায় পৌঁছে যেতে পারে।

অথচ হিজবুল্লাহ সিরিয়ায় যেসকল মুজাহিদীনে আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে লড়ছে, তারা সবাই ইসরাইল ও আমেরিকার দুশমন। (এটিও স্পষ্ট জেনে রাখা উচিৎ যে, বাশার আল আসাদ একজন "নুসাইরী শিয়া" আর ইরানী শিয়ারা অর্থাৎ "ইসনা আশারিয়ারা" নুসাইরী শিয়াদেরকে কাফের বলে থাকে। কিন্তু যেখানে আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ হয়েছে, সেখানে ইরান নিজে যাকে কাফের বলছে তার কাতারে দাড়িয়ে গেছে)।

এসবের দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, লেবাননে হিজবুল্লাহ এর দ্বারা ইরানের টার্গেট হলো লেবাননে শিয়াদের ক্ষমতাকে মজবুত করা এবং বাকী আরব বিশ্বে আহলে সুন্নাহর উপর বিজয় অর্জন করা। অবশ্যই তারা মৌখিকভাবে এবং মিডিয়ার মধ্যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং কিছু ফিলিস্তিনী মুজাহিদকে অনেক সাহায্যও করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের মূল সাহায্য সহযোগিতা হলো, আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে শিয়া মিলিশিয়াদের সাথে। আর এটা ফিলিস্তিনের কতক মুজাহিদকে করা সাহায্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি। তাছাড়া ফিলিস্তিনী মুজাহিদীনকে সহযোগিতায় তারা বাধ্য। কারণ, তারা এর মাধ্যমেই নিজেদেরকে উম্মাহর নেতা হিসাবে পেশ করতে পারবে।

ইরানীদের নিকট তাদের দুশমনদের সূচীতে আহলে সুন্নাহ এবং এর মুজাহিদগণ এক নাম্বারে আছেন। ইরানীদের এমন কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না, যেখানে তারা আহলে সুন্নাহর ক্ষতি সাধনের সুযোগ পেয়েও কোন ক্ষতি করেনি। অতএব ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার বিষয়টি তাদের অগ্রগণ্য বিষয়ের একেবারে শেষে থাকলে থাকতে পারে, অন্যথায়

তাদের প্রথম অগ্রগণ্য বিষয় হলো, আহলে সুন্নাহর এলাকাগুলো দখল করা। তবে এরই সাথে এমন কোন সুযোগও তারা হাতছাড়া করবে না যেখানে তারা উম্মতে মুসলিমার নেতা হিসাবে নিজেদেরকে দেখাতে পারে।

১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক হামলার পূর্বে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার পক্ষ থেকে চাপ ছিল। আমেরিকা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর মারকাজগুলোর উপর আক্রমণ করল। এটা এমন এক সময় ছিল, যে সময়টাতে উম্মাহর দু'আ শাইখ উসামার সাথে ছিল এবং তিনিই ফিলিস্তিনের আযাদির জন্য উম্মতে মুসলিমাকে জাগানো ও ঐক্যের ডাক দিচ্ছিলেন। কিন্তু ইরান কিভাবে এটা বরদাস্ত করতে পারে?

তাই তারা এক ভদ্র লোকের মাধ্যমে শাইখ উসামাকে ইরান এসে বসবাসের আলোচনা করল। শাইখ বিষয়টি বুঝে ফেললেন এবং নেহায়েত কঠিনভাবে তা রদ করে দিলেন। যার কারণে সাথিদের কাছে নির্দেশ আসল, সাথিরা যেন তার সাথে সাক্ষাৎও না করে। অতঃপর যখন ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা হলো এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার পতনের কারণে মুজাহিদরা ইরান ও পাকিস্তানের দিকে ছুটলেন, তখন ইরান একদিকে এসকল মুজাহিদকে ধরে ধরে জেলে পাঠাল, তাদেরকে আজীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দিলো। অথচ তারা ইরানের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করেননি।

অপরদিকে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সাথে সাথে ইরান নিজেদের টিভি চ্যানেলগুলোতে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোতে প্রোপাগান্ডা শুরু করে দিলো যে, এই হামলা খোদ আমেরিকানরা করেছে, এর মধ্যে ইহুদীদের হাত রয়েছে ইত্যাদি। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, আহলে সুন্নাহ মুসলমানগণ যেন নিজেদের আসল মুহাফেজ তথা মুজাহিদীনকে চিনতে না পারে; বরং তারা যেন শুধু ইরানকেই নিজেদের দিক নির্দেশক হিসাবে দেখে।

ইরান আমেরিকা পরস্পরে দোস্ত না দুশমন?

বাস্তবতা এটাই যে, ইরান আমেরিকা পরস্পরে কখনোই দোস্ত ছিল না। আবার তারা সব জায়গায় সব কাজে দুশমনও ছিল না।
কখনো তারা দুশমন আবার কখনো পরস্পরে সহযোগী ও একমতের হয়ে কাজ করেছে। বিভিন্ন স্বার্থ তাদের পরস্পরকে কাছাকাছি করে আবার এই স্বার্থের বিবাদই তাদের পরস্পরকে বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয়। নিজের বড়ত্ব অর্জন; তাদের সমস্ত বিবাদের মূল।

ইরানের চিন্তা চেতনা পূর্বের পারস্য সালতানাতের চিন্তা চেতনার মতই। যারা পুরা দুনিয়াকে করায়ত্ত করতে চাইতো। আমেরিকা যেখানে যেখানে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়ছে সেখানে ইরান ও আমেরিকার মাঝে পূর্ণ সহযোগিতা আছে। যেমন, পূর্বে বলেছিলাম ইরাক, ইয়েমেন ও শামে আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরান ও আমেরিকা পরিপূর্ণ এক হৃদয়ের দুই দেহ। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবুও তাদের মাঝে বিবাদ হয় কেন?

আসলে তাদের মাঝে বিবাদ এজন্য হয় যে, আমেরিকা ও ইরান উভয়েই আরব বিশ্বের উপর নিজের ক্ষমতা কায়েম করতে চায়। সৌদি আরব, আরব আমিরাতসহ পুরা আরব বিশ্বের উপর আমেরিকার (অঘোষিতভাবে) কবজা আছে, আর ইরানও এই পুরা এলাকা নিজের আয়ত্তে আনতে চাচ্ছে; এটাই তাদের দ্বন্দ্বের কারণ, এজন্যই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে দাড়ায়। এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, আমেরিকার জন্য পূর্ব মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের এমন আচরণ অনেক উপকারী, যতক্ষণ তা সীমার মধ্যে থাকবে। যদি ইরানে এ আচরণ খতম হয়ে যায় এবং আরব দেশগুলো ইরানী ঝুঁকি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তাহলে আমেরিকা এবং আরব দেশগুলোর মাঝে "বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক" যে কোন সময় ঝুঁকিতে পড়বে। তাই ইরানের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার কারণে আরব শাসকদের ঝুঁকি থাকায় এর মোকাবেলার অজুহাতে আমেরিকা নিজের "সমর্থন ও সহযোগিতার" ঝুলি নিয়ে এখানে উপস্থিত থাকতে পারছে।

সৌদি তেলের ডিপোতে ইরানী মদদপুষ্ট হুথিদের হামলার পর আমেরিকা সৌদিতে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে, যেমনিভাবে তারা কুয়েত ও সৌদির উপর কবজা প্রতিষ্ঠার জন্য সাদ্দামের

নাম ব্যবহার করেছিল। সাদ্দাম যখন কুয়েতের উপর হামলা করতে যাবে তখন হামলা শুরু হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা সাদ্দামকে আশ্বস্ত করেছিল যে, সে কোন রকম নাক গলাবে না। কিন্তু হামলা হওয়ার সাথে সাথে, তাকে হটানোর বাহানায় সে এসে পুরা জাযিরাতুল আরবকে কবজা করে নিলো এবং আজ পর্যন্ত সেখানকার সম্পদ লুট করে চলছে।

আজ আরব শাসকদের ইরান ভীতিকে, আমেরিকা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে। যদিও আরব বিশ্বের উপর আমেরিকার কবজার মূল কারণ, আরব শাসকদের ইসলামের প্রতি দুশমনি এবং তাদের বিলাসিতা। এজন্যই তারা মুজাহিদীন ও কল্যাণকামী জনগণের দুশমন। এদেরকে চাপে রাখার ক্ষেত্রেও এই শাসকরা আমেরিকান সাহায্য সহযোগিতাকে জরুরী মনে করে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, ইরান। আরব দেশগুলোকে আমেরিকার কলোনি বানানোর ক্ষেত্রে ইরান, আমেরিকার একজন সহযোগী। ইরানী চাপ শুধু নামেই নয়, বাস্তবেও আরবদের বিরুদ্ধে ইরানের সামরিক ও রাজনৈতিক অগ্রসরতা জারী আছে।

আবারও বলছি, এ পর্যন্ত ইরানের অগ্রসরতায় আমেরিকা ইরানকে হয়তো পুরা সহযোগিতা করছে অথবা নিজের উল্লেখিত স্বার্থে চোখ এড়িয়ে চলছে। ইরানের অগ্রসরতার অনুমান এভাবে করতে পারেন যে, ইরান ইরাককে মজবুতভাবে কবজা করে ফেলেছে। রাজনৈতিকভাবে ইরাকে ইরানেরই রাজত্ব চলছে। তাইতো ইরাকের জনসাধারণের মাঝে ইরানের অবস্থান ও হস্তক্ষেপ বিরোধী এখন যেই আন্দোলন চলছে, এর আন্দোলনকারীদেরকে ধমকিয়ে ইরানের আয়াতুল্লাহ খামেনি তেহরানে সেনাবাহিনীর এক প্যারেড অনুষ্ঠানের ভাষণে বলেন, 'নিয়ম কানুনের সীমার মধ্যে থেকো অন্যথায় কঠিন হস্তে তোমাদেরকে দমন করব'। ইরানী খামেনি! ইরাকী জনগণকে ধমকানো!! এ দুইয়ের মাঝে কী সম্পর্ক?

এটা এজন্যই সম্ভব হয়েছে যে, ইরাক পুরোটাই ইরানী রাজনৈতিক কবজায় আবদ্ধ। কাসেম সোলাইমানি ইরাকে এমনভাবে আসা যাওয়া করত, এমন ভাবে ঘুরত, মনে হয় যেন ইরাক ইরানের কোন একটি প্রদেশ। সিরিয়াও পরিপূর্ণভাবে ইরানের আন্ডারে আছে। লেবাননের হুকুমতও ইরানের সন্তুষ্টি ছাড়া গঠন হতে পারে না। আর ইয়েমেনের হুথিরা প্রকাশ্যভাবেই ইরানী মিলিশিয়া, যারা ইয়েমেনের পর সৌদির দিকে আগানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। তাই আরব বিশ্ব ইরানী কর্তৃত্বের নিশ্চিত শঙ্কায় আছে।

ইরানের বিস্তৃতিলাভকারী সমর্থন, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সৌদিকে সংকীর্ণ করে চলছে। সে ইরানকে যতটুকু ভয় পাচ্ছে, পালাতে চেষ্টা করছে এবং নিজেকে হেফাজত করতে চাচ্ছে, আমেরিকা তাকে ঠিক ততটুকু কোলে উঠিয়ে নিচ্ছে, তার উপর নিজের কর্তৃত্বকে মজবুত করছে, তার সম্পদ লুটছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজের দাবা খেলার সুন্দর সুযোগ পাচ্ছে। ইরানের অস্তিত্ব এবং তার ক্ষমতা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষামূলক সিদ্ধান্তগুলো ফলাফলের ভিত্তিতে আমেরিকার জন্য সর্বদিক থেকে উপকারী। এই সব অবস্থার উপকার ইসরাইলও ভালভাবে ভোগ করছে।

ইসরাইলের সাথে আরব দেশগুলোর বাহ্যিক সম্পর্কের দূরত্ব ছিল, কিন্তু যেহেতু তারা ইরানী দানবকে ভয় পায়, তাই ইরানের মোকাবেলায় তাদেরকে আমেরিকার সাপোর্ট ও আশ্রয় পেতে হলে শর্ত হলো, তাদের সাথে ও ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্ব ও নৈকট্য থাকতে হবে। তাই সৌদির ইরানভীতির কারণে ইসরাইলের বিরাট ফায়দা হয়েছে। আজকে সৌদী এবং আরব আমিরাত ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে গেছে। বর্তমানে ইসরাইল ও আমেরিকা কুদসের ভূমিতে এখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত নির্যাতনমূলক অভিযান চালাতে পারছে তার কারণ, এখন ফিলিস্তিনী মুসলমানরা আরব জনগণের সব ধরনের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। সকল আরব শাসক এখন পুরোপুরি ইসরাইলের মিত্র। এখন যে কোন জনসাধারণ বা জিহাদী ব্যক্তি ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপকারে সামনে বাড়ছে, আরব শাসকরা অনেক কঠিন হস্তে তাকে দমন করছে। সৌদিতে মুজাহিদীনকে এবং সরকার বিরোধীকে ধরার জন্য মোবাইলের মধ্যে অনেক উঁচু পর্যায়ের একটি নজরদারী এ্যাপ (Pegasus) ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই নজরদারী এ্যাপটি সৌদিকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে ইসরাইল। অনুরূপ আরব আমিরাতে নিয়মিত ইসরাইলি ড্রোন তৈরি হচ্ছে। টাকা দিচ্ছে আরব আমিরাত, ইঞ্জিনিয়ার দিচ্ছে ইসরাইল, ড্রোনে উভয়ে অংশীদার। স্বাভাবিকভাবে এ ড্রোনগুলো মুজাহিদীনের বিরুদ্ধেই ব্যবহার হবে। মিশর এই ড্রোনগুলোই মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। সিনাই মরুভূমিতে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে মিশর যেই অপারেশন চালিয়েছিল সেখানে এই আমিরাত-ইসরাইলের তৈরি ড্রোনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে বলেছিলাম, ইরান ও আমেরিকার মাঝে কিছু দুশমনি আছে। তবু খোদ আমেরিকাই ইরানকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, আজ তারা সকল আরব দেশের জন্য ঝুঁকি হয়ে আছে। কিন্তু যখন ইরান নিজের জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং উম্মতে মুসলিমার ঐ সকল সম্পদের দিকে সামনে বাড়ার চেষ্টা করে, যার উপর আমেরিকা এবং তার গোলাম আরব শাসকদের কর্তৃত্ব আছে, তখন আমেরিকার তাকে সীমা পর্যন্ত আটকে রাখার জন্য সিগনাল দেয়। যেমন, হুথিরা যখন থেকে সৌদির উপর মিসাইল হামলা শুরু করল এবং আরব উপসাগরে সৌদি জাহাজগুলোর উপর হুথিদের হামলা হলো তখন আমেরিকা ইরানকে কঠোর হুমকি দিয়েছিল।

সৌদি তেলের ডিপোতে হামলা ছিল ইরানের অনাকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ এবং অনেক সীমাতিরিক্ত পদক্ষেপ, তাই আজ এর জবাবে ইরানী জেনারেলকে হত্যা করা হলো, আবার সে হলো কাসেম সোলাইমানির মত ব্যক্তি। এটা আমেরিকারও অনাকাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ। এটা আমেরিকার পক্ষ থেকে ইরানের জন্য পয়গাম, তারা যেন ঐ সীমার মধ্যে থাকে যা তাদেরকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এরচেয়ে আগে বাড়াটা অগ্রহণযোগ্য।

কাসেম সোলাইমানির মৃত্যুর পর যখন রেডিও তেহরানে আহাজারী চলছিল, তখন এক ইরানী বললো, 'কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে আবারও এটা প্রমাণিত হলো যে, আমেরিকা সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। প্রথমবার প্রমাণিত হয়েছে ১৯৮৮ ঈ.-তে যখন পারস্য সাগরে আমেরিকা ইরানী জাহাজকে নিজ সমুদ্র সীমা থেকে ক্রুজ মিসাইল হামলা করে ধ্বংস করেছিল। সেই ঘটনায় ২৯০ জন ইরানী শহীদ হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৬৬ জন ছিল শিশু।' ইরানের আহাজারীর ধোঁকাবাজি ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই! বাস্তবেই তখন আমেরিকা ইরানী জাহাজ ধ্বংস করেছিল এবং এই পরিমাণ ইরানীও মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো: আমেরিকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কি এ দুটিই মাত্র ঘটনা? ইরানী জাহাজ, আর কাসেম সোলাইমানির হত্যা!? এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, শাম, মালি, সোমালিয়া বরং পুরা দুনিয়ায় আমেরিকার হাতে যেই মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হয়েছে সেগুলো কি তেহরানের মতে কোন রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়??

জি হাঁ, সেগুলো তেহরানের মতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। কারণ, সেখানের প্রবাহিত খুন আহলে সুন্নাহর; কোন শিয়ার নয়। এই কারণেই আজ পর্যন্ত এই সকল জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইরান কখনো কথা বলেনি এবং কোন শিয়া আলেমের পক্ষ থেকে এসব জুলুমের কারণে জিহাদ ফরজ হওয়ার ফাতাওয়া বা আবেদনও আসেনি।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু এই খুন প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে খোদ ইরানও শরিক আছে এজন্য তেহরান রেডিও এর আলোচনা কখনোই করবে না।

তৃতীয়ত: ১৯৮৮ ঈ. -তে আমেরিকা আপনাদের জাহাজ ধ্বংস করেছিল, তো এরপর আপনারা কী করলেন! আপনারাতো এরপরই আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা ও সাহায্যকারী হয়ে গেলেন!

(আপনাদের দাবী অনুযায়ী) আপনাদের জাহাজ ধ্বংস করে আমেরিকা সন্ত্রাসী হয়ে গেছে। তাহলে এরপরও কেন আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে আপনি তার মিত্র হয়ে গেলেন? এই সন্ত্রাসী, জালেম, কাফের ও শয়তান আমেরিকার মিত্র!! এটা শুধু এজন্যই করেছেন যে, এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো আহলে সুন্নাহ এর খুন প্রবাহিত করা। তাহলে আহলে সুন্নাহর উপর তোমাদের বিজয় অর্জনের জন্য তোমরা ঐ ব্যক্তিরও সাহায্যকারী ও মিত্র হয়ে যেতে পারো যাকে তোমাদের খামেনি "সবচে বড়

শয়তান" বলেছে এবং সে খোদ তোমাদেরও দুশমন ও হত্যাকারী! অতএব, এমন পরিস্থিতিতে আজ যা ঘটল সেটাকে আমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল বলব না কেন?!

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ অনেক আগেই বলেছিলেন, 'ইরান যেই ফসল বুনছে সেই ফসল শীঘ্রই নিজে কাটবে বা একটু দেরীতে কাটবে। যখন সে নিজের ফসল কাটবে তখন অন্য কাউকে নয় বরং নিজে নিজেকেই যেন তিরস্কার করে!'

এখনো এটা বুঝা যাচ্ছে না যে, ইরান ও আমেরিকার মাঝে এই সংকট বর্তমানের তীব্রতা থেকে বাড়বে কি না? তবে এটাই বাস্তব যে, সময়ের সাথে এই তীব্রতা কমে যাবে। তার কারণ, "আমেরিকার মৃত্যু হোক" এই স্লোগান ইরানতো অনেক দিয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমেরিকার সকল জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায়ের মোকাবেলায় পূর্ণমাত্রায় "ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং মাফ ও ক্ষমার" পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এজন্য ভবিষ্যতেও এমন আশা যে, প্রতিশোধমূলক কিছু কাজ ইরান করবে; যাতে করে তার ইজ্জতও ঠিক থাকে আবার আমেরিকাও বেশি বিগড়ে না যায়।

আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধে ইরানের বিজয় চলতে থাকবে আবার আমেরিকার সাথেও তারা বাস্তবিক শত্রুতা রাখবে এটাতো অসম্ভব বিষয়। কোন এক পর্যায়ে তাদেরকে আলোচনায় বসতে হবে, (তখন সব সহজেই সমাধান হয়ে যাবে)। এজন্য এটাই মনে হচ্ছে যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে তার মৌখিক অনেক বাক্য ব্যয় হতে থাকবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমেরিকাকে মাফ করে দেওয়ার মধ্যেই সে নিজের উপকার মনে করবে।

আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় বাকী আছে সেটা হলো, ইসরাইল ও আমেরিকা এবং সৌদি সরকার সবাই মিত্র। আর এই মিত্রতায় শুধু মুসলমানরাই ধ্বংস হচ্ছে; যার উপকারিতা ভোগ করছে ইরানসহ তারা তিন জনে। জালেম সৌদি শুধু নিজের বিলাসিতার জন্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাজিরায়ে আরবকে কুফুরির আড্ডাখানা বানিয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে শাইখ উসামা রহ. সৌদি শাসকদের সাথে নিয়ম মাফিক আলোচনা করেছেন এবং এই আবেদন করেছেন যে, 'সৌদির নিরাপত্তার জন্য কোন কাফেরকে সৌদির ভূমিতে আনবেন না। এখানকার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মুজাহিদীনকে দিয়ে দিন। ইরানী শিয়া অথবা সাদ্দাম হোসাইন হোক, সবধরনের ঝুঁকির জন্য ইনশাআল্লাহ মুজাহিদীনরাই যথেষ্ট হবেন। '

যদি সৌদি তখন এটা মেনে নিতো তাহলে আজ পুরা বিশ্বের নকশা ভিন্ন রকম হতো এবং সবদিকে ইসলামের বসন্ত দেখা যেতো। কিন্তু সৌদি শাসকদের অনুমান ছিল, যদি মুজাহিদীনকে সৌদির নিরাপত্তার জিম্মাদারি দেওয়া হয় তাহলে তাদের মুনাফেকি, বিলাসিতা এবং ইসলাম বিরোধী সিদ্ধান্ত আর চলবে না। এই কারণেই তারা শাইখ উসামার আবেদনকে শুধু রদ করেনি বরং শাইখকে ফেরারি আসামি ঘোষণা দিয়েছে!! এখন অবস্থা হলো, আমেরিকা নিজ সহযোগিতার জন্য সৌদি হুকুমতকে শুধু জিহাদী আন্দোলনের বিরোধিতার শর্ত করেনি বরং এর সাথে সাথে সৌদিতে ইসলাম, লজ্জা ও সতীত্বের জানাযা পড়ানোর জিম্মাদারি দিয়েছে। আল্লাহর আদেশে কখনো হারামাইন শারিফাইনের ভূমি থেকে ইসলাম বিদায় নিবে না। কিন্তু মুহাম্মদ বিন সালমান উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতা ব্যাপক করার জন্য বিরাট বড় টার্গেটে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, যার উপর অনেক দ্রুততার সাথে কাজ চলছে। এ সবকিছু উম্মাহর দরদী ব্যক্তিদের জন্য সীমাহীন কষ্ট ও দুঃখের কারণ। তাই এখন যেসকল কাজে উম্মতে মুসলিমার ফায়দা নিহিত, যার দ্বারা উম্মাহর সকল দুশমন দুর্বল হতে থাকবে, সেগুলো করতে থাকুন। আল্লাহর যে সকল বান্দা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী দেখতে চান, তারা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ হোন।

যদি আমেরিকা এবং ইরানের মাঝে বৈরিতা বাড়তে থাকে তাহলে সরাসরি সৌদি শাসকগোষ্ঠী ও সৌদি সরকারের উপর এর প্রতিক্রিয়া পড়বে। এবং এ সবের দ্বারা ইনশাআল্লাহ আমাদের কল্যাণ হবে এবং ইনশাআল্লাহ ইয়েমেনের জিহাদী কাফেলা ও শামের মুজাহিদগণ এবং খোরাসানের শাহ সোওয়ারগণ (নিপুণ যোদ্ধা) সবার জন্য এর দ্বারা আসানী পয়দা হবে। যে পরিমাণ দ্রুত গতিতে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এতে মনে হচ্ছে, বিশ্ব জুলুমী শাসনের হায়াত

এখন আর বেশি দিন বাকী নেই। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, যে সকল অপরাধীরা এক হয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতো আজ তাদের ঐক্যে ফাটল দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এই ফাটলকে আরো বাড়িয়ে দিন এবং এর থেকে উম্মাহর মুজাহিদীনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের নিজ প্রভুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি সামনের হালতকে উম্মতে মুসলিমার জন্য কল্যাণের কারণ বানাবেন। ইনশাআল্লাহ নিকট ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ইয়েমেন ও শামে মুজাহিদীনের কার্যক্রম আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এরসাথে আবার ইনশাআল্লাহ গজওয়ায়ে হিন্দের সময় ঘনিয়ে আসা মনে হচ্ছে, যার জন্য কুফফার এবং আহলে ঈমান উভয়ের মাঝে প্রস্তুতি চলমান দেখা যাচ্ছে। যাই হোক বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম জনসাধারণকে মুনাফেক ও ঈমানের তাবুগুলো চেনা আবশ্যক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই উম্মাহ আলহামদুলিল্লাহ নেতা শূন্য নয় এবং মুহাফেজ শূন্য নয়। তাদের হাকীকী মুহাফেজ এবং পাহারাদার হলো মুজাহিদীনে আহলে সুন্নাহ। যে মুজাহিদীন উম্মাহর তৃতীয় ওমর, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ রহ. এর অদ্বিতীয় মহান কাফেলার সৈনিক। এই মুজাহিদীন যাদেরকেই উম্মাহর বড় দুশমন এবং জালেম হিসাবে পেয়েছে, তাদেরকে তাদের ঘরে গিয়ে আঘাত করেছে। তারা খোরাসান থেকে ইয়েমেন ও সোমালিয়া পর্যন্ত গত ত্রিশ বছর যাবত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে জমে আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই মহান সৈন্যবাহিনীকে তাদের জনবল ও আসবাব না থাকা সত্ত্বেও তাদের উঁচু হিম্মতওয়ালা নেতাদের মাধ্যমে, আমেরিকা এবং তার সাথে এ যুগের আহযাবকে (সমস্ত কুফফার বাহিনী) আফগানিস্তানের ভূমিতে সন্দেহাতীতভাবে পরাজিত করেছেন।

গজওয়ায়ে আহযাবের সময় কাফেরদের ব্যর্থ ও উদ্দেশ্যহীন ফিরে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মোবারক বাক্যটি বলেছেন, আজও মুজাহিদগণ তার পূর্ণ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

(الآن نغزوهم، ولايغزونا)

'এখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তারা আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না!'

জি হাঁ, এখন শুধু আমাদেরই সুযোগ। আলহামদুলিল্লাহ ইমারাতে ইসলামিয়ার বাইআতপ্রাপ্ত মুজাহিদীন খোরাসান ও ভারত উপমহাদেশ থেকে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়া পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে নিজেদের সফর জারী রেখেছেন। উম্মাহর এই হীরা ও মণিমুক্তারা ইসলামের বিজয় ও কুফুরের ধ্বংস এবং উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদাকে আজ প্রমাণিত করেছেন। যদি আপনি চান তাহলে আসুন; জিহাদী আন্দোলনের এই মহান কাফেলায় শামিল হয়ে যান। আজকে এই কাফেলার সাথে যেই নিজেকে জুড়েছে, সে ঈমানের তাবু চিনে গেছে। তাকে কোন শিয়ার "আমেরিকা নিপাত যাক" স্লোগান, সালমান বা মুহাম্মদ বিন সালমানের "খাদেমূল হারামাইন" উপাধি, এবং এরদোগানের মত লোকদের "নেতৃত্ব" আর ধোঁকায় ফেলতে পারবে না।

তাদের সামনে হক এবং আহলে হকের সেই পরিচয়ই থাকবে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার কিতাবে বয়ান করেছেন। সে প্রথমে দেখবে যে, কোনো নেতা তার দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ছাঁচের উপর পূর্ণ ফিট হচ্ছেন কি না?

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ . وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, আল্লাহ তা'আলা অচিরেই (তাদের হটিয়ে) এমন এক কওমকে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন

এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা ঈমানদারদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে আর কাফেরদের প্রতি অনেক কঠোর হবে। তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন এবং আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ঈমানদারগণ যারা নামায কায়েম করে এবং নত হয়ে যাকাত আদায় করে আর যারা আল্লাহ তা'আলা, তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। (সুতরাং শুনে রাখো, তারাই আল্লাহ দল) আর নিশ্চয়ই শুধু আল্লাহর দলই বিজয়ী। হে ঈমানদারগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশার বস্তু বানায় তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর তাকওয়া অবলম্বন করো যদি তোমরা মুমিন হও'। [সূরা মায়েদা: ৫৪-৫৭]

এই আয়াতে কারীমায় আহলে হককে চিনার সকল আলামত বর্ণিত হয়েছে এবং আহলে হক হওয়ার মাপকাঠিও বলে দেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমাকে হক, হক হিসাবে চিনিয়ে দিন এবং তাদেরকে হকের সাহায্য ও শক্তিশালী করার তাওফিক দান করুণ।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাতিল, বাতিল হিসাবে চিনিয়ে দিন এবং বাতিল থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুণ। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন কুফফার ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সকল ইমানদার ও মুজাহিদগণকে সাহায্য করেন এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের আগামীকে উম্মাহর হেদায়াত, নুসরত ও ইজ্জতের যুগ বানিয়ে দেন। আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. برحمتك يا ارحم الراحيمن.

('নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ' ম্যাগাজিনের জানুয়ারী-২০২০ সংখ্যার ৫৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

গাজওয়াতুল হিন্দ

GAZWATUL HIND

সময়ের আহবান

মুহাম্মাদ আলী প্রতাপঘুড়ী

তারবিয়াহ । ৪৪

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

নিশ্চয় ইমারতে ইসলামিয়ার মহান বিজয় - উম্মতে মুসলিমার জন্য অন্তর প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমরা দোয়া করি, তিনি যেন ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীল ও মুজাহিদিনদেরকে দ্বীনের উপর কায়েম ও দায়েম রাখেন এবং এ বিজয়ের বিজয় আনন্দে সমস্ত উম্মতকে শরীক করেন। আমীন।

স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, নিশ্চয় এ বিজয় অর্জন এত সহজ বিষয় ছিল না। এই ইমারতে ইসলামিয়ার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে, শুধু মুজাহিদিনে কেরাম নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন বিষয়টা এমন নয়। বরং আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণ নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। নিজেদের জান-মাল, সহায়-সম্পদ এবং সর্বশেষ নিজের রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে এর মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেন। নিঃসন্দেহে সে খবীর (সব খবর রাখনে ওয়ালা), বাছীর (সব দেখনে ওয়ালা), আলীম (সব জানলে ওয়ালা) জানেন যে, কি পরিমাণ মেহনত আর মুজাহাদা ব্যয় হয়েছে। তাই শুকরিয়া (আল্লাহ তা'আলার জন্য) যিনি শুধুমাত্র এ কুরবানির বদলা দিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ের পর সমস্ত দুনিয়ার জিহাদ ও ক্বিতালের পতাকা কি অবনমিত করে দেওয়া হবে? এ বিজয়ে সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে? না আরো কাজ আছে যা আঞ্জাম দিতে হবে?
হে আমার প্রিয় ভাই!

সবে মাত্র শুরু হল। এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। এটা হল একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় কালিমার পতাকা সমুন্নত করা এবং বিজয় অর্জন করা। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপমা আমরা আমাদের সামনে রাখতে পারি। তারা এক মহাদেশ বিজয় করে দ্বিতীয় মহাদেশের দিকে অগ্রসর হতেন, অতঃপর তৃতীয় মহাদেশ। এভাবে চলতে থাকতো, যার ফলে পুরো দুনিয়াতে আজ ইসলামের আলো বিস্তীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মাকবারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ (মাসিক পত্রিকা) এর নাম পরিবর্তন করে নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ রাখা আমাদের জন্য একটি মহান দাওয়াত। যেখানে উচ্চস্বরে আহ্বান করা হচ্ছে;

হে ঘোড়সওয়ার! এখনি নিজেদের হাতিয়ার রেখে দিয়ো না। মঞ্জিলে পৌঁছার জন্য এখনো কিছুদূর পথ বাকি আছে, যা পাড়ি দিতে হবে। আরো আহ্বান জানানো হচ্ছে - হে হিন্দুস্থানের মুসলমানরা! আফগানিস্তানের মুসলমানরা তাদের ফরজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে এবং ভালভাবে তা আঞ্জাম দিবে ইনশা আল্লাহ। কিন্তু এখনো হিন্দুস্থানে কুফর ও জুলুমের বিস্তার এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। আর এ অন্ধকার রাতের ধ্বংসলীলা বলে দিচ্ছে, আপনাদের ফরজ এখনো বাকি আছে। এখানে এখনো নিজ বাসিন্দাদের সফর শুরু হয়নি।

হে হিন্দুস্থানের প্রিয় মুসলমানগণ!

আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং মুসলমানদেরকে জুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ। এখন হিন্দুস্থানে দাওয়াত ও জিহাদের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আগে, শরয়ী জিহাদকে সাধারণ জনগণের মাঝে প্রসার করার পূর্বে অনেক বেশি জরুরি এবং আবশ্যক হলো, সঠিক চিন্তা-চেতনা ও ঈমানী নূরে আলোকিত এমন একটি জামাত তৈরি হওয়া, যারা পুরো হিন্দুস্থানের মানুষদের পথ প্রদর্শন করবে। দোস্ত ও দুশমনের পরিচয় তুলে ধরবে, অতঃপর দ্বীনের বিজয় অর্জনের পথে যত বাধা বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত করে গাজওয়াতুল হিন্দের ডঙ্কা বাজাবে। প্রিয় ভাই, হিন্দুস্থানে কাশ্মীরী মুসলমানদের সাহায্য ও হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। কাশ্মীরী মুসলমানরা কয়েক যুগ যাবত কুরবানি দিয়ে আসছেন। কিন্তু তাদের লক্ষ্যের পথে বসে কিছু প্রতারক তাদের কুরবানির রাস্তাকে মঞ্জিল থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ তার লক্ষ্য 'কাশ্মীরের ভূমির স্বাধীনতার" দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেউ আবার তা 'জাতিগত স্বাধীনতার" দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ লাভের জন্য তাদের পবিত্র রক্ত নিয়ে ব্যবসা করেছে।

কিন্তু কাশ্মীরী মুজাহিদগণ এখন তা বুঝে গেছেন যে, তাদের কল্যাণ ও সফলতা শুধু ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার মাঝে নিহিত রয়েছে।

কাশ্মীরে চলমান জিহাদ কেবল ঐ সময় সঠিক চিন্তাধারা ও সঠিক পথে পরিচালিত হবে, যখন সেখানে যুদ্ধরত মুজাহিদিনে কেরাম কেবল এ জন্যই যুদ্ধ করবে এবং সে ভূখণ্ডকে কেবল এ জন্যই ভালবাসবে যে, সেখানে মুসলমানদের বসবাস আছে এবং এ মাজলুম ও বঞ্চিত মুসলমানদের জালেম ও কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের সাহায্য করতে হবে। সে এটাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ বলে মেনে নিবে।

সে তার জান-মাল দিয়ে এ জন্য মেহনত করবে যেন, সে গাজওয়াতুল হিন্দের মাগফুর (ক্ষমাকৃত) দলের 'মুকাদ্দামাতুল জাইশ' বা প্রথম সাড়ির লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সর্বশেষ এ মেহনত শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হবে। কিন্তু ভালো ভাবে স্মরণ রাখতে হবে, কাশ্মীরের জিহাদ হিন্দুস্থানের মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া অগ্রসর হবে না। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতে অবস্থানরত মুসলমানদের অংশগ্রহণ কাশ্মীর এবং হিন্দুস্থানের সাহায্য ও বিজয়ের পথকে সুগম করবে। আর আমরা যদি ভূখণ্ড ভিত্তিক আলাদা ভাবতে থাকি, তবে কখনো সফলতার মুখ দেখতে পাব না। বরং আমাদের ভূখণ্ডেরও সফলতা ও কামিয়াবি কাশ্মীরীদের নুসরত করার মাধ্যমে আসবে, ইনশা আল্লাহ। এ জন্য বর্তমান সময়ে হিন্দুস্থানের মুসলমান, বিশেষ করে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতে অবস্থানরত মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, তারা বিভিন্ন জায়গায় মুজাহিদদের ত্বয়েফা গঠন করবে। তাদেরকে ঈমান, ইয়াক্বিন, দ্বীন ও শরীয়তের ইলম শিক্ষা দিবে।

সাথে সাথে জিহাদের ফারিযাহ এবং কলা-কৌশল শিক্ষা দিবে। তাদের মাঝে বীরত্ব ও গাইরতে ঈমানী জাগ্রত করবে এবং তাদের উৎসাহিত করবে। যেন তারা তাদের প্রতিবেশী কাশ্মীরী মাজলুম মুসলমানদের, ঘর-বাড়ি হারা মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলমানদের এবং তাদের পাশে যুগ যুগ যাবত জুলুমের যাঁতাকলে পৃষ্ঠ হওয়া পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। ঐ মুসলমান, যে সত্য সংবাদ প্রদানকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস রাখে, যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান রাখে, সে কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদিনে কেরামকে মাগফেরাত এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্য দোয়া ও সুসংবাদ শুনে বসে থাকতে পারে? সে কেমন মুসলমান? মুখলিস মুমিন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া পাওয়ার জন্য একজন আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতা করত।

কাশ্মীরের জিহাদ গাজওয়াতুল হিন্দের একটি প্রবেশ পথ। যেখান দিয়ে প্রবেশ করে হিন্দুস্থানের কাফের শাসকদের গলায় বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসা হবে ইনশা আল্লাহ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের মুসলমানদের উপর ফরজ হলো তারা নিজেদের দ্বীনের সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়াবে। আর এর মাঝেই তাদের জন্য কল্যাণ ও কামিয়াবি রয়েছে। তারা তাদের পার্শ্ববর্তী কাশ্মীরীদের প্রতি নজর দিবে এবং কাশ্মীরের জিহাদকে নিজেদের জান-মাল ও দোয়া দ্বারা কামিয়াব করবে। সেখানে কালিমার পতাকা উত্তোলন করে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে ইনশা আল্লাহ।

আসুন! আমরাও নিজেদের নাম এই তালিকায় লিখিয়ে নেই। যার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করে এখানেই শেষ করছি।

অনুবাদঃ মাওলানা জাকির আহমাদ ('নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের এপ্রিল-২০২০ সংখ্যার ৭২ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

একজন শহীদ ‘মা’
এবং তাঁর চার শহীদ ছেলের কাহিনী

হাফেজ খুবাইব আহমাদ
অনুবাদঃ খালেদ উমর

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ বড়ই সত্য কথা বলেছিলেন যে, যখন কোন শহীদ নিজের রবের কাছে যায়, তখন সে একা যায় না; বরং সে নিজের সাথে আমাদের অন্তরের একটা অংশ সঙ্গে নিয়ে যায়। অতঃপর তার রয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো আমাদেরকে অন্ধকারে রাস্তা দেখানোর কাজ করে থাকে। তাঁর উঁচু হিম্মত, বিশেষ প্রতিভা, ভালো গুণাবলী, সত্য ও হক্কের পথে নির্ভীকতা, ইশক ও জযবা; আমাদেরকে হক্ক ও সত্য পথের দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদের হিম্মত আরও বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের এই প্রিয় ভাইগণ যাদের সম্পর্কে আমি উল্লেখ করছি, তাদের স্মৃতিগুলো আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এরা ছিলেন এক মায়ের চার আপন সন্তান।

১. সাইফুর রাহমান (হুজাইফা)
২. হামেদ (তালহা)
৩. মু'সা (হামজা)
৪. ঈ'সা (কাশেম)

এই চারজন লোক এমন ছিলেন, যাদের চরিত্রের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের গুণাবলী পাওয়া গিয়েছিল।

তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দ্বীনের পতাকাকে দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করতে নিজের জীবনের সবটুকু কুরবানি করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ঐ সময়ে জিহাদের আমলকে জিন্দা করেছিলেন যখন মানুষদের মধ্যে শুধুমাত্র জিহাদের নাম শোনা যাচ্ছিল।

মিথ্যা ও কপটতার এই দুনিয়ার আরাম-আয়েশ তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত করতে পারেনি। তাঁরা দুনিয়ার সকল তুচ্ছ খাহেশাতগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজের রবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া জান্নাত অর্জনের খাতিরে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁরা শুধুমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় জিহাদের ফরজিয়াতকে আদায় করার লক্ষ্যে এবং উম্মাহ'র সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিজের প্রিয়জন ও আরাম-আয়েশের জীবন বর্জন করে জিহাদের এই কঠিন পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা সর্বদা নিজ জবানে এ কথাই এলান করে গিয়েছেন যে, তাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে অন্য কোন কিছু প্রিয় নয়। কেননা, তাঁরা এ কথাই বুঝেছিলেন যে, জিহাদ দ্বারাই আমাদের এই মাজলুম উম্মাহ'র হক্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি আমরা জিহাদ ছেড়ে দেয়, তাহলে আমাদের মা, বোন ও মেয়েদের ইজ্জতের নিরাপত্তা থাকবে না। নিজেদের মাজলুম উম্মতের ব্যথা ও পেরেশানি অন্তরে ধারণ করে এই চার দ্বীনের মুসাফির জিহাদের পথে বেড়িয়ে পড়েছিলেন।

জিহাদের এই বিপদসংকুল পথের সকল কষ্ট ও পরীক্ষাসমূহ তাদের ঈমান ও ধৈর্যকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিত। এর ফলে তাঁরা নিজের রবের কাছে এতই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল যে, রাব্বে কারীম তাদেরকে এই অস্থায়ী দুনিয়া থেকে স্থায়ী জান্নাতের নিয়ে গেছেন (অর্থাৎ, তাদের সবার শাহাদাত নসীব হয়েছিল)। তাঁরা শহীদের মর্যাদায় আসীন হন। তাঁরা শাহাদাতের মত এমন মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু কেনই বা কামনা করবে না? এর কামনা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন! এ ব্যাপারে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, "ঐ সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, আমার তো আশা যে, আমাকে আল্লাহর রাস্তায় কতল করা হবে, আবার জীবিত করা হবে। পুনরায় কতল করা হবে; আবার জীবিত করা হবে। আবার কতল করা হবে, পুনরায় জীবিত করা হবে; এবং আবার পুনরায় হত্যা করা হবে"। (সহিহ বুখারী)

সুতরাং, এই চার জান্নাতের মুসাফির নিজের রক্ত দিয়ে এমন এক নিদর্শন রেখে গেছেন, যা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উম্মাহ'র জন্যে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হবে। নিঃসন্দেহে তাদের এই ঈমানী চেতনা, খুলুসিয়াত, তাক্বওয়া ও আখলাক চরিত্র; তাদের পিতা-মাতার প্রতিপালনের ফসল ছিল। জিহাদী কর্মে এক ভাই অন্য ভাইয়ের থেকে আগ বেড়ে শরীক হওয়ার প্রতিযোগিতা করতেন। ইবাদত বন্দেগীতে তারা কোন কমতি করতেন না। প্রত্যেক ভাই একজন আরেকজনের চেয়ে ইবাদতে আগ বেড়ে করার চেষ্টায় মগ্ন থাকতেন।

এক ভাই আমকে বলেছিল, 'আমি তাদেরকে অতি কাছ থেকে দেখেছি। তাদের ভাইদের আমি দেখতাম যে, তাঁরা সর্বদা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। বিশেষ করে তাদের চেষ্টা থাকত, তাঁরা যখনই কোনো আমল করত গোপনে একাকী নির্জন ভাবে করার; যাতে তাদেরকে অন্য কেউ না দেখে এবং তাদের অন্তরে অণু পরিমাণও লৌকিকতা না আসতে পারে। তাঁরা নিজ 'বড়দের' ও 'বাবা-মা', আমীর মুরুব্বীগণের ইহতেরাম-সম্মান, সবার সাথে মোহাব্বত এবং ছোটদেরকে স্নেহ ও শফকত, আদর করতেন।

তাদের সম্মানিত পিতা-মাতা সন্তানদের প্রতিপালনের হক্ব সম্পূর্ণ ভাবে আদায় করেছিলেন। সন্তানদের প্রতিপালনে কোন কমতি রাখেন নি। তাদের সম্মানিতা 'মাতা' নিজ সন্তানদের কোলে থাকতেই জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ জোগানো নাশিদ ও কবিতা শোনাতেন'।

আমার সম্মানিত এক উস্তাদ বলেছেন যে, 'এই চার জান্নাতের মুসাফির তখন ছোট্ট ছোট্ট ছিল। আমি অধিকাংশ সময় দেখতাম - তাদের পিতা তাদেরকে ছোট অবস্থায় মুজাহিদীনদের মারকাজ কেন্দ্রে নিয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি নিজের ছোট দুই সন্তানকে নিজের সাথে ঘুরাতে নিয়ে যেতেন। যাতে, ছোটকাল থেকেই তাদের অন্তরে জিহাদের প্রতি উৎসাহ-উন্মাদনা এবং উম্মাহ'র জন্যে নিজের সবকিছু কুরবান করার হিম্মত ও জযবা সৃষ্টি হয়। যখন তাদেরকে সামরিক প্রস্তুতির জন্যে পরিভ্রমণ করানো হয়েছিল, তখন তাদের বয়স এত কম ছিল যে, পিস্তল পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম হচ্ছিল না'।

সুবহানাল্লাহ! অন্যদিকে নিজ সন্তানদের প্রতিপালনের এই অবস্থা ছিল যে, ছোটকাল থেকেই তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীতে রত থাকত। আর অন্যদিকে আজকের সমাজের শিশুরা বাবা-মা'র কোলে ইংরেজি ভাষার শব্দমালা এমনভাবে শিখে, যেমনিভাবে অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কালেমা তাইয়েবা এবং কুরআনে কারীমের আয়াত শিক্ষা করতেন। আমাদের এখনকার মুসলমানদের সমাজে সন্তানদের প্রতিপালনই এমন হয়ে গেছে; তখন অপরের উপর অভিযোগ করে আর কি লাভ হবে!

আমার ঐ প্রিয় ভাইদের সম্মানিতা মাতা হযরত খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্মৃতিগুলো পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি নিজ পবিত্র রক্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ করেছেন যে, নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর বরকতময় দ্বীনের বিজয়ের খাতিরে রক্তের হাদিয়া আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন বস্তু তার কাছে প্রিয় নয়।

ঐ ভাইদের মাতা পুণ্যময়ী, সাহসী এবং অভিজাত রমণী ছিলেন। তিনি ইসলামের বিজয়ের জন্যে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত উম্মাহ'কে সত্য পথের দিকে আহবান ও সত্যের আলো দেখানোর খাতিরে নিজের স্বামী এবং সন্তানদের সাথে হিজরত করে জিহাদের মাঠে চলে আসেন।

তিনি তাঁর বাচ্চাদেরকে হিজরত ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্যে মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। ঐ সম্মানিতা মাতা নিজ উম্মাহ'র মাতাগণকে এ বার্তা দিয়ে গেছেন যে, এ উম্মাহ'র সফলতা এবং বিজয়ের জন্যে আজও মুসলমান নারীদেরকে নিজের সন্তানদের সঠিক প্রতিপালনের দ্বারা ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজ সন্তানদেরকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ'র প্রতিরক্ষায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় বের হওয়া ও জিহাদী পথের জটিলতা, কষ্ট ও পরীক্ষা সমূহ ধৈর্য নিয়ে সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। পুনরায় আবার হযরত সাইয়েদা খাওলা ও খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। ইনশা আল্লাহ।

ঐ চার ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় ছিলেন 'সাইফুর রাহমান'। তিনি (রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি) দ্বীনি ইলম অর্জনে অনেক আগ্রহী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানে দরসে নেজামীর সপ্তম বর্ষে পড়ছিলেন। যখনই মাদরাসা ছুটি হতো, তখনই তিনি জিহাদী কাফেলার অভিমুখী হতেন। ছুটি অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় মাদরাসায় গিয়ে নিজ পড়ালেখায় ইলম অর্জনে মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি (রহ.) পাকিস্তানে ইলম অর্জনে মগ্ন থাকাকালীন সময়ে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার কথিত অপরাধে পাকিস্তানের গোপন এজেন্সিগুলো সাইফুর রাহমান ভাইয়ের তল্লাশি শুরু করে দেয়।

গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো তাঁর পিছু নেওয়াতে তিনি চিরস্থায়ীভাবে জিহাদের ময়দানে হিজরত করে চলে আসেন। পরে তাকে মুজাহিদীনদের আমিরগণের পরামর্শে দপ্তরী শাখায় জিহাদী কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

সাইফুর রাহমান ভাই, নিজ ইচ্ছায় আনন্দের সহিত জিহাদী কর্ম সম্পাদন করতেন। পাশাপাশি সাইফুর রাহমান (রহ.) ভাইয়ের অন্তরে ইলম অর্জনের যে ইশক ছিল, তার জন্যে সময় বের করতেন এবং জিহাদী কাফেলায় উপস্থিত উলামায়ে কেরামগণ থেকে ইলম হাসিল করতেন।

১৪৪০ হিজরী শাবানের শেষের দিকে সাইফুর রাহমান ভাইয়ের বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের কিছু দিন পরেই আমেরিকার গোয়েন্দা উড়োজাহাজ গুলো তাঁর অবস্থানরত এলাকায় আকাশ বিচরণ করা শুরু করে দেয়। ফলে তিনি গাঁ-ঢাকা দিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করে রমজানের শেষ দিনগুলোতে এক আনসার সাথী ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছেন এবং ঈদুল ফিতর ওখানেই অতিবাহিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ঈদের দিন তিনি সেখানকার উপস্থিত সাথীদের সাথে মিলিত হন এবং আফগানিস্তানের হালমন্দ নদীতে সাঁতারের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

পরের দিন সাইফুর রাহমান ভাই সাথীদের সাথে নদীতে গোসল করতে যান এবং দুইজন সাথীসহ তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তিন-চার জন সাথী নদীর ঢেউয়ের দিকে দূরে চলে গেলেন, আর অন্যান্য সাথীগণ নদীর কিনারায় তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

আফগানিস্তানের 'হালমন্দ নদী' নিজ গভীরতা ও ঢেউয়ের কারণে প্রসিদ্ধ! আর ঐ দিন নদীর ঢেউ অনেক বেশি ছিল। নদীতে লাফিয়ে পড়া ঐ তিন সাথী সাঁতার কাটতে কাটতে কিছু সময় পরেই হয়রান হয়ে পড়েন। পানিতে হাত-পা চালানোর কার্যক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে হামিদ ভাই পানির ঢেউয়ের সাথে কিনারায় উঠে আসেন। কিন্তু ওয়ালিদ ভাই ও সাইফুর রাহমান ভাই, ডুবার উপক্রম হলে নদীর কিনারায় উপস্থিত নৌকার পাশে কিছু লোক তাদের দু'জনকে বাঁচানোর জন্যে নদীতে লাফিয়ে পড়ে। তাঁরা ওয়ালিদ ভাইকে বের করে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু নদীর উত্তাল ঢেউয়ের কারণে তাঁরা সাইফুর রাহমান ভাইকে বের করে আনতে সক্ষম হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ এলাকার অনেক লোক একত্রিত হল এবং ঐ এলাকার বিজ্ঞ ডুবুরীও পৌঁছে গেল। ছোট-বড় সবাই মিলে সাইফুর রাহমান ভাইকে নদীতে খোঁজা শুরু করল। কিন্তু তাঁর কোনো চিহ্নের খোঁজ মিলেনি! চারদিন পর্যন্ত বিরতিহীন চেষ্টা করার পর পঞ্চম দিন তাঁর শরীর দূরের এক এলাকায় পাওয়া গেল। চারদিন লাগাতার পানিতে ভাসতে থাকার পরও তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সহিহ সালামত ছিল। আর ঢেউয়ের কারণে পাথরের উপর আঘাত লাগাতে তাঁর শরীর হতে তাজা রক্ত পরছিল। পরবর্তীতে ঐ এলাকায় সাইফুর রাহমান (রহ.) ভাইয়ের জানাযার নামাজ পড়ানো হয়েছিল এবং ওখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। সাইফুর রাহমান (রহ.) এর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন 'হামেদ ভাই'। হামেদ ভাই বলেন, সাইফুর রাহমান ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে আমার অন্তরে আশ্চর্য এক অবস্থা হয়েছিল। যেমন- মনে হচ্ছিল যে, আমাদের কাছ থেকে কোনো মূল্যবান দামী জিনিস হারিয়ে গেছে। কিন্তু অন্য দিকে এ কথার খুশি ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমার প্রিয় ভাইকে কবুল করে নিয়েছেন এবং শাহাদাতের মত মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর দুয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন। হামেদ ভাইয়ের সাথে আফগানিস্তানের এক এলাকায় আমার পরিচয় হয়েছিল। একদিন আমাদের মারকাজ কেন্দ্রে দুইজন নতুন সাথী আসে। যাদেরকে আমি চিনতাম না এবং আমি তাদেরকে এর আগে কখনো দেখিনি। যখন পরিচয় হয় তখন জানতে পারলাম যে, তাদের মধ্যে একজন হল হামেদ ভাই। হামেদ ভাই গম্ভীর স্বভাবের অধিকারী এবং ইখলাস ও তাক্বওয়ার পরিপূর্ণ উদাহরণ ছিলেন।

হামেদ ভাই মুজাহিদীনদের কেন্দ্রে সাথীদের খেদমতে আগে আগে থাকতেন। যখন রুটি পাকানোর সময় হতো তখন তিনি বলতেন যে, রুটি আমি পাকাব।

পানি নেওয়ার সময় হলে তখন তিনিই আগ বাড়িয়ে করতেন। মোটকথা প্রত্যেক কাজই তিনি আগ বাড়িয়ে করতেন।

হামেদ ভাই অন্যান্য সব সাথীদেরকে অনেক মোহাব্বত করতেন এবং বড়দের আদব-ইহতেরাম ও ছোটদের মোহাব্বত ও স্নেহ করতেন। তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক সুন্নাতের উপর অন্তর ও জান দিয়ে আমল করতেন। নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও সুন্নাতের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহ দিতেন। একদিন তিনি বলতে লাগলেন, 'আরে! আমার প্রিয় ভাই, আপনার কাছে কি পাগড়ি নেই?' আমি উত্তরে বললাম, 'জী হ্যাঁ! আমার কাছে পাগড়ি আছে'। তখন তিনি আমাকে মোহাব্বতের সাথে অনেক সুন্দর ভাবে বলতে লাগলেন, 'দেখো ভাই, পাগড়ি পরিধান করা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং পাগড়ি পরিধান করে নামাজ পড়া পাগড়িবিহীন নামাজ পড়ার চাইতে সত্তর গুণ উত্তম; এই জন্যে পাগড়ি পরিধান করুন'। আমি বলেছি, 'জী; ইনশা আল্লাহ! আগামী থেকে পরিধান করব'।

হামেদ ভাই গীবত পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতেন। কখনো কারো গীবত শোনা পছন্দ করতেন না। যদি মাহফিলে বা সভায় কারো গীবত শুনতেন। তখনই অনেক নম্র-ভদ্র ভাবে মোহাব্বতের সাথে বড়-ছোট সবাইকে বুঝাতেন এবং সাথীদেরকেও গীবত থেকে বাঁচাতেন।

একবার তিনি বরফের উপর জুতা-বিহীন হাটছিলেন। কেউ তাকে কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, 'প্রিয় ভাই! ই'দাদ ও জিহাদের জন্যে প্রস্তুতির নিয়তে চলছি। যার কারণে আল্লাহ'র পক্ষ থেকেও সওয়াবের আশা করি'। তার বয়স কম ছিল কিন্তু তারপরও জিহাদের প্রতি ইশক অনেক ছিল, যা তাঁকে ঠাণ্ডা, গরম, দিন, রাত, সহজ-কঠিন প্রত্যেক অবস্থায়ই জিহাদী কর্মে নিজেকে কুরবানি করার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিত।

আমার প্রিয় দোস্ত হামেদ ভাই! কুরআন ও ইলম অর্জনে অনেক উৎসাহী ছিলেন। যখনই তাকে দেখেছি তিনি কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন বা দ্বীনি কিতাবাদী মুতা'আলায় থাকতেন অথবা নিজ মুজাহিদ ভাইদের খেদমতে লিপ্ত থাকতেন। তিনি কখনোই নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট হতে দিতেন না। দ্বীনি ইলমের প্রতি তার অনেক মোহাব্বত ছিল এবং প্রত্যেক আগত সময়ে এই ইলমের মোহাব্বত এবং ইলম অর্জনের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেত। তাঁর (রহ.) শাহাদাতের এক মাস পূর্বে তিনি আমাকে চিঠি লিখেন; যার মধ্যে তিনি নিজের জন্যে ইলম অর্জন ও অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার উপর দরখাস্ত করেছিলেন। ঐ চিঠিতেই তিনি আমাকে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক সুন্দর ভাবে লিখেছিলেন -

'প্রিয় ভাই! এখন তো নিশ্চিত আপনি ভোরে তাড়াতাড়ি উঠায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আর আমার জন্যেও দুয়া করবেন, মাঝে মাঝে অলস হয়ে যাই'। অথচ আমি যতদিন তাঁর সাথে অতিবাহিত করেছি, তাঁর তাহাজ্জুদ নামাজ কখনো ছুটে যেতে দেখিনি। সুতরাং এটা তাঁর বিনয় ছিল এবং আমাকে উৎসাহ প্রদানের জন্যে নিজের অলসতার কথা আলোচনা করেছেন'।

হামেদ ভাই নিজ আনসার সাথী ভাইদের সাথে অত্যন্ত মোহাব্বত এবং মিলমিশ রাখতেন। একবার হামেদ ভাই কিছু সাথী ভাইদের সাথে দুশমনের হামলা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজের মারকাজ কেন্দ্র হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে দুই-তিন দিনের জন্যে একজন আনসার ভাইয়ের বাড়িতে উঠেন। ওখানে কিছু সাথী তাদের পরিধানের কাপড় দান করেছিলেন। যখন আনসার ভাই ময়লাযুক্ত কাপড় নিয়ে যেতে আসলেন, তখন হামেদ ভাই সাথে সাথে উঠে আনসার ভাইকে বললেন, 'ভাই! আমার কাপড় দিয়ে দেন; আমি ধুয়ে নিব'। কিন্তু আনসার ভাইও ছিল একগুঁয়ে, অনড়। তিনি কাপড়গুলো নিয়ে চলে গেলেন। আনসার ভাই যাওয়ার পরে হামেদ ভাই কামরায় এসে বসলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়ছিল যে, তাঁর কারণে আনসার ভাই কষ্ট করছেন।

এক ভাই আমাকে বলেছেন, ‘একদিন আমরা পাঁচ-ছয় জন সাথী মারকাজ কেন্দ্রে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ এক সাথী আমাকে প্রশ্ন করে যে, আমাদের সাথীদের মধ্যে এমন কোন ভাই আছে, যাকে জীবিত শহীদ বলা যেতে পারে? তৎক্ষণাৎ আরেক ভাই হামেদ ভাইয়ের নাম নিলেন। কেননা, হামেদ ভাই ইবাদত, নাওয়াফেল, বিশেষ করে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত; অধিকাংশ সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, আদব-আখলাক, বিনয়ী, নম্র-ভদ্র, বড়দের সম্মান, আমিরগণের হুকুমের আনুগত্য, মুজাহিদ ভাইদের সাথে মোহাব্বত, ছোটদের সাথে আদর-স্নেহ, এছাড়া অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া, আন্তরিকতার সাথে জিহাদী কর্মে লিপ্ত থাকা, সাথী ভাইদের সেবায় নিয়োজিত নিজ সাথী ভাইদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর খাতিরে নিজেকে নিজে কষ্টে ফেলা ইত্যাদির বাস্তব উদাহরণ ছিলেন। এরপর সকল সাথীরা তাঁর কথার সম্মতি দিয়েছেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে তাঁর দরবারে নিয়ে গেছেন’।

কুরআনে এ আয়াতটি এমন লোকদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে।

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ((سورة ال عمران: ١٦٩

“অর্থাৎ এবং (হে মানুষ!) যে সকল লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনোই মৃত মনে কোরো না। বরং তাঁরা জীবিত; তাদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে রিজিক প্রদান করা হয়”। (সূরা আল-ইমরান ৩; ১৬৯)

আয়াতটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, শহীদগণ এখনো জীবিত। তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার পক্ষ থেকে রিজিক প্রদান করা হয়; কিন্তু আমরা বুঝিনা। “মু’সা ও ঈ’সা” এ দু’জন সাইফুর রাহমান ও হামেদ ভাইয়ের ছোট ভাই। এ দু’ভাইও বড় ভাইদের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। আন্তরিকতা, তাক্বওয়া, আদব-ইহতিরাম এবং জিহাদের আবেগ ছোটকাল থেকেই তাদের মধ্যে ছিল। তারা দু’জন সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উচ্চ গুণাবলী দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করতেই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা নিজ মুজাহিদ ভাইদেরকে অনেক মোহাব্বত করতেন।

আরেকটা গুণ যা তাদের সব ভাইদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল; সেটা হল, তাদের দ্বারা সাথীদের নিরাপত্তা ও শান্তি কায়েম হওয়া। তাদের দ্বারা সাথীরা কোনো ধরণের কষ্ট বা অনিরাপদ বোধ করতেন না। তাদের মধ্যে “অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া” - এ গুণটি অধিক পরিমাণে ছিল। যেমনটা আনসারী সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

(ويوثرون علي انفسهم ولو كان بهم خصاصه (سورة الحشر: ٩

“অর্থাৎ তাঁরা মুহাজির ভাইদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। যদিও তাঁরা দারিদ্রাবস্থায় জীবন-যাপন করতেন”। (সূরা আল হাশর ৫৯; ৯)

একদিন মারকাজ কেন্দ্রে অনেক সাথী অবস্থান করছিলেন। রাতে যখন ঘুমানোর সময় হলো তখন মু’সা ভাই সাথীদের আধিক্য ও বিছানার কমতি দেখে জমিনেই বিছানা ছাড়া শুয়ে পড়লেন। আমি যখন বাহিরে বারান্দায় গেলাম, তখন দেখি মু’সা ভাই বিছানাপত্র বিহীন মাটিতে শুয়ে আছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়ে একটি কম্বল ও একটি বালিশ এনে তাকে ডেকে বলি, ‘এগুলো নিন’।

তিনি তখনও জাগ্রত ছিলেন এবং আমাকে বললেন, ‘এগুলো আপনি রাখুন, আমার প্রয়োজন নেই। আমি আজ বিছানা ছাড়াই ঘুমাব’। আমি বললাম, ‘আমার কাছে পর্যাপ্ত বিছানা রয়েছে। এগুলো আপনার জন্য এনেছি’। তখন তিনি বললেন, ‘তাহলে এগুলো অন্য কোন সাথী ভাইকে দিয়ে দিন’। আমি বললাম, ‘মু’সা ভাই! সকল সাথীই বিছানা পেয়েছে; এগুলো অতিরিক্ত ছিল’। কিন্তু তারপরও মু’সা ভাই নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং আমাকে বলেন, جزاك الله خيرا ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন; এগুলো নিয়ে যান। আসলে আজ আমি বিছানা ছাড়াই ঘুমাতে চাই’। আমাদের উচিৎ যে, আমরা বিছানা ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস তৈরি করা। কেননা, অধিকাংশ স্থানে এমন হয় যে, সাথী বেশি হওয়ার কারণে বিছানার ঘাটতি দেখা দেয়, এই জন্যে যখন আগে থেকেই বিছানাপত্র ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস তৈরি হয়ে যাবে,

তখন ইনশা আল্লাহ বিছানাপত্র ছাড়া ঘুমাতে কোনো কষ্ট হবে না। এই দুই ছোট ভাইয়ের মধ্য জিহাদী অভিযানে যাওয়ার অনেক আগ্রহ ছিল। তাঁরা চাইত যে - আমরা আমাদের হাত দ্বারা আল্লাহর দুশমনদের শাস্তি দিব। যখনই জিহাদের জন্যে তাশকীল করানো হত, তখন নিজেই নিজেদের নাম দিতেন।

ঈ'সা ভাইয়ের বয়স কম ছিল এবং দাড়ি না থাকায় তানযীমের আমিরগণ তাকে জিহাদী অভিযানে পাঠাতেন না। যদিও বা ঈ'সা ভাই, মুসা ভাইয়ের সাথে অনেক অভিযানে সময় দিয়েছিলেন। মু'সা ও ঈ'সা ভাই আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলের স্থানীয় মুজাহিদীনদের সাথে আত্মোৎসর্গীয় হামলার জন্যে ট্যাঙ্ক, গাড়ি, বারুত এবং জ্যাকেট ইত্যাদিও তৈরি করেছেন।

একবার এক এলাকায় অতি মাত্রায় ঠাণ্ডা পড়ছিল। মু'সা ভাইয়ের নিকট পরিধান করার জন্যে কোন কোট বা জ্যাকেট ছিল না। তখন তাঁর সম্মানিতা মাতা মু'সা ভাইকে বলেন, 'আমি তোমার জন্য ঠাণ্ডার জ্যাকেট আনব?' মু'সা ভাই বলেন, 'আমি ঠাণ্ডার পোশাক পরিধান করব না'। ঐ দিন মু'সা ভাই গনিমতও পেয়েছিলেন, যা তিনি তৎক্ষণাৎ সাদাকা করে দেন। অথচ তখন তাঁর পোশাকের অতি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি পোশাক ক্রয় করার পরিবর্তে গনিমতের পয়সা গুলো সাদাকা করে দেন। মু'সা ও ঈ'সা ভাই উভয়েই হাফেজে কুরআন ছিলেন। তাদের বড় ভাই হামেদও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। মু'সা ভাই অধিকাংশ সময়েই বিশেষ করে যোহরের নামাজের পরে কুরআন মাজিদের তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। যখনই রমজানের পবিত্র মাস আগমন করত, তখন হামেদ, মু'সা ও ঈ'সা ভাই প্রত্যেকেরই এ চেষ্টা থাকত যে, তারাবীহ তাঁরা নিজেরাই পড়াবে এবং তারাবীহতে কুরআন মাজিদ খতম করবে। তিনজন একসাথে; একজন পড়বে, আর আর বাকী দুইজন শুনবে। কিন্তু তিন জনের মধ্যেই কুরআন শুনানোর আগ্রহ ছিল বিধায় তাঁরা নিজ নিজ মুক্তাদি খুঁজে পৃথক পৃথক ভাবে তারাবীহ পড়াতেন।

মু'সা ভাই অনেক আন্তরিকতার সাথে জিহাদী কর্মে লিপ্ত থাকতেন। কোন কাজকেই ছোট মনে করতেন না এবং কোনো কাজকে দোষনীয় মনে করতেন না। যে ধরণের কাজই হোক, চাই তা মারকাজ কেন্দ্রে ঝাড়ু-মোছার কাজ হোক বা মুজাহিদীনদের সেবা করা হোক কিংবা রান্না করা, পানি নেওয়া, থালা-বাসুন ধৌত করা ইত্যাদি। মোটকথা, প্রত্যেক কাজই আনন্দের সাথে করতেন।

একবার কিছু ভাই রাশিয়ান রাইফেলের ম্যাগাজিন ও বুলেট যা মাটির ভিতর পুঁতে রাখা হয়েছিল; এগুলো বের করে আনলেন। এগুলোকে মাটিতে পুঁতার পূর্বে গ্রীজ লাগানো হয়েছিল, সাথীরা এগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। কিছুক্ষণের ভিতরেই রাইফেল পরিষ্কার করে নিলো। কিন্তু বুলেট বেশি হওয়াতে সাথীরা এ বলে রেখে দিল যে, পরে সুযোগ হলে আস্তে আস্তে এগুলো পরিষ্কার করবেন। কিন্তু পরের দিন মু'সা ভাই নিজেই সামনে এসে বুলেট গুলো এ বলেই পরিষ্কার করতে লাগল যে, এ বুলেট গুলো যেখানেই ব্যবহৃত হবে, আর এগুলো দ্বারা যত দ্বীনের দুশমনদেরকে হত্যা করা হবে এর সওয়াব আমি পাব। আমিও স্নাইপার মুজাহিদের সওয়াবের মধ্যে অংশীদার হব। প্রায় দুই দিন পর্যন্ত মু'সা ভাই, ঐ বুলেট গুলোর পরিষ্কারে লিপ্ত ছিলেন এবং এগুলোকে পেট্রোল দিয়ে ভালো ভাবে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলেন।

ঈ'সা ভাইয়ের ঐ হাস্যজ্জ্বল আলোময় নূরানী চেহারা আজও আমার সামনে ভেসে উঠে। সে হল আমার নিষ্পাপ ছোট ভাই ঈ'সা, যে একদিন আমাকে বলেছিল যে, 'প্রিয় ভাই! আসো, আজ নদীর তীরে যাব। সেখানে ওজু করে আসরের নামাজ পড়ব এবং পুনরায় ফিরে আসব'। ঐ দিন আমরা যে মসজিদে ছিলাম, সেখান থেকে নদী প্রায় দশ মিনিট দূরত্বে। আমি তাকে বললাম, 'ঈ'সা ভাই আপনি হাঁটুন; আমি আসছি'। কিছুক্ষণ পরে আমি নদীর তীরে পৌঁছায়ে দেখি যে, ঈ'সা ভাই ওজু শেষ করে নামাজের জন্যে তাঁর মাসলা ঠিক করছেন। আমি বললাম, 'ঈ'সা ভাই! দুই মিনিট অপেক্ষা করুন, আমার ওজু করার পরে একসাথে জামাতে নামাজ পড়ব'। ঈ'সা ভাই আমাকে বলল, 'প্রথমে আসেননি কেন? আমি আর অপেক্ষা করব না'। আমি ওজু করছিলাম। হঠাৎ ঈ'সা ভাই পিছন থেকে এসে এক হাত আমার মাথায় রেখে অপর হাত দিয়ে আমার উপর পানি ঢালছিল।

আমি কিছুই বুঝতে পারিনি যে, আমার সাথে কি হচ্ছিল! আমার জামা পর্যন্ত সামনে থেকে ভিজে গিয়েছিল। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি, ঈ'সা ভাই হাসতে হাসতে তাঁর মাসলায় গিয়ে দাঁড়াল। এবং আমাকে বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন'।

আমি ওজু করে ঈ'সা ভাইয়ের সাথে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার উপর রাগ করনি তো?' আমি বললাম, 'না; কখনোই নয়। এটা তো রসিকতা ছিল, আর রসিকতা এমনই হয়ে থাকে'। এরপর আমরা জামাতে নামাজ পড়ি এবং মসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কিছুদিন পর আমি ও ঈ'সা ভাই মসজিদের বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ ঈ'সা ভাই বলে উঠে, 'আজ আমি আপনাকে একটা জিনিস দিতে চাই'। তারপর তিনি তাঁর ক্লাসিনকোভের একটি ম্যাগাজিন থেকে কিছু বুলেট আমাকে দিয়ে বলে, 'আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া কবুল করুন। এগুলো আমার নিজস্ব বুলেট'। ঐ ভাইগণের মাতা, তাঁর বড় ছেলে সাইফুর রাহমানের শাহাদাত এবং বিচ্ছিন্নতায় একটু কঠিন অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন। যা তার শাহাদাতের আগ্রহ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি জীবনের শেষ দিন গুলোতে এ দুয়াই করতেন যে, "ইয়া আল্লাহ! আমাকে আমার সন্তানদের সাথে কবুল করে নিন"।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দীর দুয়া তাড়াতাড়ি কবুল করে নেন। সাইফুর রাহমান (রহ.) ভাইয়ের শাহাদাতের তখনো চার মাস অতিবাহিত হয়নি। ২৩ই নভেম্বর ২০১৯ এ আফগানিস্তানের হালমন্দ প্রদেশে আমেরিকা ও মুরতাদ আফগান বাহিনীর সম্মিলিত এক হামলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দীকে তিন সন্তানের সাথে কবুল করে নেন এবং শাহাদাতের মত মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু দ্বারা সম্মানিত করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই সম্মানিত মা ও তাঁর চার সন্তানের শাহাদাতকে কবুল করে নিন। তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

('নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের এপ্রিল-২০২০ সংখ্যার ১০৯ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

বদরের ময়দানে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার আমলী দৃষ্টান্ত

হাফেজ তায়্যিব নাওয়াজ শহীদ রহিমাহুল্লাহ

তারবিয়াহ। ৫৫

বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা ইসলামী আক্বিদার ভিত্তি এবং لا اله الا الله محمد الرسول الله এর অপরিহার্যতা এবং শর্তসমূহ থেকে একটি। কিছু উলামায়ে কেরামতো এমনও বলেন যে, তাওহীদের নিশ্চয়তা এবং শিরকের প্রত্যাখ্যানের পরে কুরআন মাজিদে যত গুরুত্ব ولاء براء (বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা)-র উপর দেওয়া হয়েছে, এমন গুরুত্ব অন্য কোন মাসআলার উপর দেওয়া হয়নি।

যদি গভীর চিন্তা ফিকিরের সাথে গবেষণা করা হয়, তাহলে কুরআন মাজিদের অনেক বড় অংশ ولاء براء (বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা)-র সাথে সংশ্লিষ্ট হিসেবে পাওয়া যাবে। এমনকি এই মাসআলা সত্যায়নের জন্য কিছু পরিপূর্ণ সূরা নাজিল করা হয়েছে। যেমন - সূরা তাওবাহ, সূরা মুমতাহিনা এবং সূরা কাফিরুন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"তোমাদের জন্যে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহিমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমার উপরই ভরসা করেছি, তোমার দিকেই মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন"। (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

اوثق عري الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله

"ঈমানের সবচেয়ে মজবুত কড়া হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ রাখা"। (الطبراني الكبير 172\1111537)

الولاء والبراء এর এই আক্বিদাহ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়েছিল। তারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার জন্যই বিদ্বেষ এবং শত্রুতার সুস্পষ্ট কিছু দৃষ্টান্ত রমজান মাসে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে সামনে এসেছিল।

হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) নিজের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিলেন। মূল কারণ শুধু এইটাই ছিল যে, পিতা কুফরের পতাকা নিয়ে এসেছিল আর আবু উবায়দা (রাঃ) নিজের জীবনের সবকিছু দিয়ে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে হযরত মুস'আব বিন উমায়ের (রাঃ) নিজের ভাই উবাইদ বিন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। তার অন্য এক ভাই যুরারাহ বিন উমায়ের যিনি আবূ আযীয মক্কী নামে প্রসিদ্ধ, তিনিও কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাকে যখন হযরত আবূ আইয়ুব আনসারি (রাঃ) যুদ্ধের পরে বন্দী করার জন্য বাঁধছিল তখন হযরত মুস'আব (রাঃ) এর দৃষ্টি তার দিকে পরে। তিনি আনসারি (রাঃ)-কে বললেন, "হে ভাই! এই বন্দী যুবককে ভালো করে বাঁধুন। তার মা অনেক সম্পদশালী"।

এটা শুনে যুরারাহ আশ্চর্য এবং রাগান্বিত হয়ে বলল, "তোমার রক্ত কেমন সাদা হয়ে গেছে যে, তুমি অপর ব্যক্তিকে নিজের ভাইয়ের পরিবর্তে সম-মর্যাদা দিচ্ছ?" তখন হযরত মুস'আব (রাঃ) বললেন যে, "তুমি ভুল বুঝেছ। তুমি আমার ভাই নও। বরং আমার ভাইতো সে, যে তোমাকে বেঁধেছে"।

এই যুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের মামা আস বিন হিশামকে নিজের হাতে হত্যা করেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর সন্তান আব্দুর রহমানও বদর যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। একদিন সন্তান পিতাকে বলল যে, "আপনি বদর যুদ্ধে আমার তরবারির নিশানায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু আমি পিতার হক্কের বিবেচনা করে ছেড়ে দিয়েছি"।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "যদি তুমি আমার নিশানায় চলে আসতে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম এবং সন্তান হওয়ার সামান্য পরিমাণ বিবেচনাও করতাম না। কারণ আমার ভালোবাসা প্রদর্শনের স্থান তুমি নও বরং ইসলাম, আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিল এবং আছে"।

এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দ্বারা সম্মানিত করলেন এবং কাফেরদেরকে লজ্জাজনক পরাজয় দ্বারা অসম্মানিত করলেন। কাফেরদের সত্তর (৭০) জন বন্দী হলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দীদের ব্যাপারে নিজের সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। সহিহ মুসলিম শরিফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে - হযরত উমর (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - প্রত্যেকে নিজের প্রিয়জনকে হত্যা করবে। আলী (রাঃ)-কে আদেশ দিন যেন, তার ভাই আকিল এর গর্দান ফেলে দেয়। কেননা সে ছিল কাফেরদের পথ প্রদর্শক এবং নেতা"। মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী (রহঃ) সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের এমন ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ এবং দ্বীনের জন্য সব কিছু বিলীন করার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত গাযওয়াহ, জিহাদ - নিজের গোত্র, আত্মীয়, ভাই, বন্ধু এবং প্রিয়জনদের বিরুদ্ধেই ছিল। ভিন্ন কোন রাষ্ট্র বা অপরিচিত গোত্রের সাথে ছিলনা। বদর যুদ্ধে মুহাজিরিনদের সামনে কারো পিতা, কারো কলিজার টুকরা সন্তান, কারো ভাই, কারো চাচা, কারো মামা এবং অন্যান্য সম্পর্কের আত্মীয় উপস্থিত হয়েছিল। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ধর্মের জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর তরবারি কোষ মুক্ত হয়েছিল। আর একারণেই আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। ঈমানতো এমনি ভালোবাসার নাম যার সামনে লায়লা-মজনুর কাহিনী ম্লান হয়ে যায়। কুরআন-হাদিসে হিজরতের অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এই হিজরত হলো এমন - আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজের মাতা-পিতা, স্ত্রী, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে দেওয়া। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন হিজরত করেছিলেন, তখন যার জীবনসঙ্গিনী কুফরকে ইসলামের বিপরীতে প্রাধান্য দিয়েছে, তখন ঐ সাহাবী (রাঃ) সারা জীবনের জন্য জীবনসঙ্গিনীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তারা স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ-সম্পত্তি এবং ঘর-বাড়ি ছেড়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করে মদিনার পথ ধরলেন। এ কারণে আল্লাহ তাদের উপর খুশি হয়ে গেলেন।

হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! আমাদেরকে পুনরুত্থিত করুন তাদের দলে। তাদের ভালোবাসা এবং আদর্শের উপর শহীদ হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমীন।

হে আমার প্রিয় ভাই, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তা একটি ফেতনা। মূর্তি পূজার পরে গোত্রের পূজা এবং জাতীয়তা পূজার স্থান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন -

انما المؤمنون اخوة

"নিশ্চয় সকল মুমিন ভাই ভাই"। (সূরা হুজুরাত 49:১০)

এবং

ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا

"নিশ্চয় সকল কাফের তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু" (সূরা নিসা 4:১০১)

এই দুই মূলনীতিকে সামনে রেখে মুসলিমদেরকে নিজের ভাই এবং শত্রু নির্ধারণ করতে হবে।

অনুবাদঃ মাওলানা আজিজুর রহমান (নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের মে-২০২০ সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)

গাজওয়াতুল হিন্দ

আসুন, নবীজীর কথার বাস্তব নমুনা হই!
আসুন, নবীজীর সুসংবাদ গ্রহণ করি!

মুহাম্মাদ শাকের তুরালী
অনুবাদ: সাহাল বিন ওমর

স্বাধিন খোরাসান ভূমিতে ত্রিতত্ত্ববাদ ও একত্মবাদের মাঝে যুদ্ধের প্রায় দেড় যুগ হয়ে গেছে। এ বালুময় ভূমিকে হিন্দুস্তান ও কাশ্মীরের হাজারো নওজোয়ান তাদের বুকের তপ্ত খুনে সিক্ত ও সুরভিত করেছেন। যুদ্ধের সময়টাতে হিন্দুস্তান ও কাশ্মীরের জিহাদী তাশকিলে তৈরি মুহাজিরগণ, খোরাসানের মাটিতে হিজরত করেছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিলো। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর নির্দেশনা ছিলো এবং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহিমাহুল্লাহ-এর সাহায্যের আহ্বানের প্রতি মুজাহিদিনদের লাব্বাইক ছিল। খোরাসানকে সাহায্য করা উপমহাদেশের মুজাহিদগণের উপর একটি ঋণও ছিল বটে। কারণ ইমারতে ইসলামিয়া তার প্রথম যুগে কাশ্মীর জিহাদে সাহায্য করেছিল। বরং কাশ্মীর জিহাদের বহু কার্যক্রমের মারকাজ ছিল ইমারতে ইসলামিয়া। পশতুন এক মুজাহিদ কবি একারণেই ইমারতে ইসলামিয়া নিয়ে বলেছিলেন –

নাম ইমারাত/ কার্যত খিলাফাত
আমাদের রহস্য ঈমানী শক্তি/আমাদের শেআর দ্বীনী সম্মান।
ইসলামী ইমারাত/ ইসলামি ইমারাত।

আজ পুনরায় আরেকবার সেই আহত উপত্যকা ও হিন্দের দুঃখী ভূমি (কাশ্মীর) খোরাসান ও পাকিস্তানের বাজ পাখিদের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু বাজ পাখি নয়; বরং তাদের সাহায্য সহযোগিতাকারী ও নেতাদের দিকেও তাকিয়ে আছে। আপনারা আসুন! প্রায় দুই শতাব্দী যাবত শরীয়তের অপেক্ষমাণ এই ভূমির পিপাসা নিবারণ করুন।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এখন ইমারতে ইসলামিয়াকে আল্লাহ তা'আলা বিজয়ের মালা পরিয়েছেন। তাই এখনই সময়, গাজওয়ায়ে হিন্দের সবধরনের ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু করা। রুশদের পরাজয়ের পর আরব মুজাহিদগণ উক্ত উপত্যকায় বাঘের মত স্বাধীনভাবে জিহাদ শুরু করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকারের আওতাধীন কাশ্মীরের পুরাতন মুজাহিদরা এবং তাদের পথপ্রদর্শকরা এখনো আরব মুজাহিদদের সেই ছাউনিগুলোর জায়গা চিনে থাকবেন। কিন্তু কিছু "দয়াবান লোক" মুজাহিদদের এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং মারকাজগুলোকে ইমারতে ইসলামিয়ার শুরুর জামানায় বন্ধ করিয়েছেন। কেন কাশ্মীর জিহাদের ব্যাপারে তাদের এমন দুশমনি ছিল? এর জবাব এটাই যে, এই 'দয়াবানরা' কখনোই উপত্যকায় 'স্বাধীন জিহাদ' চাননি। 'স্বাধীন জিহাদ' মানে এই 'দয়াবানদের'(পাকিস্তান সরকারের) পলিসিমুক্ত স্বাধীন জিহাদ।

মুহসিনে উম্মাহ, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর এবোটাবাদ বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত ডকুমেন্টগুলো থেকে জানা যায় - শাইখ উপত্যকার ব্যাপারে গভীর খোঁজ-খবর রাখতেন। এমনকি সাধারণ মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধার সিদ্ধান্তগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতেন। আলহামদুলিল্লাহ! মুজাহিদীনে কাশ্মীর এখনো ঐ গাড়িটি ব্যবহার করছেন, যেটা শাইখ উসামা রহ. কাশমীর উপত্যকায় এক শানদার আক্রমণের পর কমান্ডার ইলিয়াছ কাশ্মীরি রহ.-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে হিন্দুস্তানে আল-কায়দার পক্ষ থেকে জার্মান বেকারিতে শানদার হামলা, অন্যান্য ময়দানে ইলিয়াস কাশমীরীর সাহায্য ও প্লান, পাইওয়ানের আক্রমণগুলো, ইহুদীদেরকে টার্গেট কিলিং, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে শাইখ আফজাল গুরুর হামলা, কাশ্মীরে "হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত" মানহাজে শাখা গঠন, বার্মা, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং খোরাসানে দাওয়াত ও জিহাদের বাহিনী তৈরি ইত্যাদি; এই সবই হল, কেয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদির সাথে সম্পৃক্ত ঐ মহান যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়; যার সুসংবাদ দিয়েছেন স্বয়ং হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ঘোষণা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মোবারক জবানে বলেছেন এবং এর জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাযি. খুব আগ্রহী ও অস্থির ছিলেন।

তাই খোরাসান ও পাকিস্তানের সকল মুজাহিদদেরকে এই গাজওয়ায়ে হিন্দের প্রতি আগ্রহ দেখানো উচিত। আলহামদুলিল্লাহ! উম্মাহর মুখলিস ও সম্মানিত নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই এ ব্যাপারে দাওয়াতী, ফিকরী, ই'দাদী ও কিতালী প্রচেষ্টা চালু রেখেছেন এবং আরো বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিইযনিল্লাহ! আমাদের এই নেতৃবৃন্দই এই যুদ্ধের ফলাফল সুষ্ঠুভাবে এই বঞ্চিত উম্মাহর কাছে বয়ে আনতে পারবেন। জিহাদী সেই নেতৃবৃন্দ আল্লাহর তাওফিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের সামনে রেখেছেন এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে করতে খুব ভেবে-চিন্তে এক এক কদম উঠাচ্ছেন। এই জিহাদী নেতৃত্ব নির্ধারণ করেছেন যে, হিন্দুস্তান-বাসীদের স্বাধীনতা হিন্দুস্তানে শরীয়ত কায়েম এবং তাদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার সদর দরজা (উপায়) হচ্ছে "কাশ্মীর জিহাদ"। কাশ্মীর জিহাদ গাজওয়ায়ে হিন্দেরও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের উম্মাহর মুজাহিদগণ আল্লাহর ঘোষিত "তাইফায়ে মানসূরা" তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দল। সকল ইসলামী রাষ্ট্রের সব মুসলিম কওমের প্রত্যেক সদস্যের প্রতিনিধি এই মুজাহিদীনের মাঝে আছে। তাদের আরো আছে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজেদের বহু পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তারা জানেন, হিন্দুস্তানে এই মুহূর্তে সামরিক পরিকল্পনা কেমন হবে এবং দাওয়াতী কার্যক্রম কেমন হবে। তারা কাশ্মীর জিহাদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জামের ব্যাপারেও অবগত। তারা এটাও জানেন যে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অধীন থেকে বের হয়ে কীভাবে জিহাদ শুরু করতে হয়, কীভাবে সেই জিহাদ জারী রাখতে হয়, এর ফলাফল কীভাবে সংরক্ষণে রাখতে হয় এবং কেন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তত্ত্বাবধান থেকে বের হয়ে জিহাদ করতে হবে। এই নেতৃত্ব কয়েক দশক যাবত আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বুঝিয়ে আসছেন। আর এখনতো এই বিষয়গুলো ইনশা আল্লাহ প্রত্যেক কাশ্মীরী মুজাহিদের স্পষ্ট বুঝে এসে থাকবে।

এমন পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের উচিত – বৈশ্বিক জিহাদী নেতৃত্বের অধীনে পূনরায় চালু হওয়া গাজওয়ায়ে হিন্দের এই আন্দোলনে অংশীদার হওয়া এবং চির সত্যবাদী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বাস্তব নমুনা হওয়া। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام.

"আমার উম্মতের দুটি জামা'আতকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। একটি জামা'আত হল, যারা হিন্দুস্তানের উপর হামলা করবে। আর অপর জামা'আত হল, যারা ঈসা বিন মারইয়াম আ.-এর সাথে (দাজ্জালের মোকাবিলায়) থাকবে"। [সুনানে নাসাঈ হাদীস নং-৩১৭৭, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-১২৪৭৫ (সহীহ)]

গত মাসে তিন ভাইয়ের শাহাদাতের পর এই উপত্যকাতে আমরা আশা ও পেরেশানির আরেকটি খবর পেলাম। আমাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন আরো দুই ভাই দুশমনের সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে শহীদ হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। তাদের মধ্যে এক ভাই আমাদের স্থানীয় জিম্মাদার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানেও কিছু কাল অতিবাহিত করেছেন এবং এই সরকারি ব্যবস্থা ও এর গাদ্দারদেরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। পাকিস্তান থেকে দু'জন মুহাজিরকে সফরসঙ্গী করে তিনি উপত্যকায় প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কুফরের মাথা ব্যথার কারণ হওয়ার পর, রব্বে গফফারের সাথে তার কৃত ওয়াদা পূরণ করলেন। "হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত"-এর পতাকাবাহী এই মুজাহিদ নেতা এবং তার মামুরের শাহাদাতের পর হিন্দু গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দাবী করছে - "হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত"-এর সৈনিক মুজাহিদীনদেরকে উপত্যকা থেকে খতম করে দেওয়া হয়েছে এবং এর মুখোশ উন্মোচন করা হয়ে গেছে।

হে উপমহাদেশের মুসলমানগণ!

ইতিহাস আমাদেরকে আজকে আবারো এক কঠিন পট পরিবর্তনের সম্মুখে দাঁড় করেছে। ঠিক তেমনই, যেমন পট পরিবর্তন হয়েছিল ৯/১১ এর পর। আজ সময় হয়েছে গাজওয়ায়ে হিন্দকে শরয়ী মানহাজের উপর দাঁড় করানোর। খেয়ানতকারী গোয়েন্দা বিভাগের তত্ত্বাবধান ছাড়া কাশ্মীর জিহাদকে তার উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর। পূর্বেকার গাজীদের সেই কারনামাগুলোকে পুনর্জীবিত করার পথ; এইতো আমাদের সামনেই। আজ এলওসি'র পাড়ে ধারাবাহিক হামলা পরিচালনাকারী বাজ পাখিদের, ডক্টর আরশাদ ওয়াহীদ রহ.-এর সাথে আমেরিকান ড্রোন হামলায় শাহাদাত-বরণকারী আমাদের কমান্ডার;

উস্তাদ আফজলকে কীভাবে ভুলে থাকতে পারি? মুত্তাহিদা জিহাদ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষক এবং জামা'আতের নেতার সিংহ শার্দূল - পাকিস্তানি জেট বিমানের বোমা বর্ষণের ভয়ে - খায়বার এজেন্সিতে শহীদ ও জিহাদের মুরুব্বি ইঞ্জিনিয়ার আহসান আজীজের রক্তের সাথে কি গাদ্দারী করবে? তারা কি বোরহান ওয়ানীর স্বপ্নগুলোকে অসম্পূর্ণ রেখে দিবে? তারা কি শরীয়তের আওয়াজ উঁচু করার পর জাকির মূসার কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়াকে ভুলে যাবে? আজও কি খোরাসানে বদর মনসূরেকে নিয়ে গর্বকারী কাশ্মীরী যুবকেরা কাশমীর উপত্যকায় তার মিশন থেকে আস্তিন গুটিয়ে থাকবে? পাকিস্তানে এবং আযাদ কাশ্মীরে অবস্থানকারী গাজী বাবার শিষ্য ও হিতাকাঙ্খীরা কি শহীদ শাইখ আফজল গুরুর কিতাব "আয়েনা" পড়ে দেখেনি? শহীদ আজমল কাসাবের সঙ্গীদেরকে কে 'জুনুদুল ফিদা' এবং 'মোস্তাফা আবু ইয়াযীদের' সাথে পরিচয় করাবে? মুজাহিদীনে কাশ্মীর কি জিহাদের নেতা কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরির রক্তের সাথে গাদ্দারির চিন্তা করতে পারে?

এসব প্রশ্নের জবাব নিশ্চিত জবাব হলো, না । তাহলে এবার আসুন! আমরা হযরত মাওলানা আসেম ওমর হাফিজাহুল্লাহ-এর নেতৃত্বে "হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত"- এর সৈনিকদের শক্তিশালী করি। সারাজীবন দাওয়াত ও জিহাদের পথে উৎসর্গকারী হাকীমুল উম্মত, বয়োবৃদ্ধ শাইখ আইমান আজ-যাওয়াহিরীকে সুসংবাদ দেওয়ার মাধ্যম আপনিই। উপত্যকা এবং হিন্দে নিজের সামর্থ্যের কানাকড়ি সবটুকু, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদী শক্তির পাল্লায় ঢেলে দিন। নিশ্চিত থাকুন, এই মারহুম উম্মতের কোন একজন ব্যক্তিও নিঃস্ব নয়। জান-মাল, উত্তম পরামর্শ দিয়ে এবং দু'আ দিয়ে, হিন্দ ও সিন্দের শাসকদেরকে শিকলে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত এই সেনাবাহিনীর অংশ হোন। তারা ইনশা আল্লাহ এখান থেকেই ইমাম মাহদির সাহায্যের জন্য রওয়ানা হবেন।

এসে গেছে এসে গেছে কারওয়ানে আল জিহাদ,
কুরআন ও সুন্নাহর বাহক আল জিহাদ।
জুলুমের ইতিহাসে মোরা দা'য়ীয়ানে আল জিহাদ,
বাতিলের খুনে রঙ্গিন হোক গুলিস্তানে আল জিহাদ।
লশকরে ইবলিশ হবে আদমের সামনে মাথানত,
মনুষ্যত্বের মোকাবেলায় শয়তানিয়্যাত হবে পদানত।
ভাঙ্গতে হবে কুফরির সব শিষ্টাচার আর মিথ্যাচার,
হযরতে মাহদির আগমন আগে চিন্তা থামার নেই যে আর।

পুরো উম্মতকে হিদায়েত করো দান, হে প্রভু;
দ্বীনকে সাহায্যের সৌভাগ্য করো দান, হে প্রভু!
দাজ্জালে ফিতনা থেকে করো হেফাজত, হে প্রভু;
'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত' দাও হিম্মত, হে প্রভু!

وما توفيقنا إلا بالله! والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .

('নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' ম্যাগাজিনের এপ্রিল-২০২০ সংখ্যার ৯১ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত)